বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৬

প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

শ্রীভোলানাথ হাজরা

রূপবাণী প্রেস

৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী

শ্যামল সেন

চার টাকা

লেখকের অন্যান্য বই

ঢোঁড়াই চরিত মানস (১ম চরণ)

ঢোঁড়াই চরিত মানস (২য় চরণ)

জাগরী (৯ম মু)

গণনায়ক (২য় মু)

সত্যিভ্রমণ কাহিনী (৩য় মু)

অপরিচিতা (২য় মু)

অচিন রাগিনী (২য় মু)

চকাচকি

সংকট (২য় মু)

চিত্রগুপ্তের ফাইল (২য় মু)

পত্র লেখার বাবা

দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ির আড্ডায় চেঁচামেচি নাই, হইচই নাই, কথা কাটাকাটি নাই। কথাবার্তাগুলো হয় থেমে থেমে। অতি সংক্ষেপে। একটু একজন বলে, বাকিটা সবাই বুঝে নেয়। সবটা কোন কথার বলতে হয় না। যে রকম গল্পর সবটা করা যায়, সেসব গল্পে এ আসরের লোকের উৎসাহ নাই। রুচির মিলের জন্যই, তিনচারজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই আড্ডাটা টিকে আছে।

রাস্তার ওদিককার বাড়িতে সেতার বাজান আরম্ভ হ'ল।

"শুরু হ'ল।"

"হ্যা-আ"

দোলগোবিন্দবাবু বললেন—"যেতে দাও। কী দরকার ওসব কথায়।"

ওই বাড়ির কর্তা নতুন বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের বন্ধুবান্ধবরা ওই বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় গানের আসর বসায়, এ জিনিস এঁদের চোখে খারাপ লাগে। সেইটা ওঁরা প্রকাশ করলেন ওই তিনটি বাক্যে।

আবার সবাই নীরব—যতক্ষণ না আর একটা নূতন বিষয়ের উপর কথা ওঠে।

নীরবতা ভাঙ্গল সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শুনে।

"ন্যাপলা আসছে।"

"হ্যা-অ্যা-অ্যা!"

দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখে একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল

"এ বাড়ির কাছাকাছি এসে ও সাইকেলের ঘণ্টা বাজাবেই বাজাবে।"

"হ্যা-অ্যা।"

ঠিকই নেপাল। সাইকেলখানাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে সে সোজা ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর। বেরিয়ে এল খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে।

"কাগজে কোন খবরটবর আছে নাকি হে নেপাল?"

"তাই দেখছি।"

গভীর মনোযোগে সে খবরের কাগজ পড়ছে দেখে সকলে অবাক হয়।...ব্যাপার কি?

দোলগোবিন্দবাবু কিন্তু একবারও নেপালের দিকে তাকাননি।

আবার মিনিট দুয়েক সকলে চুপচাপ।

রাস্তার দিক থেকে 'টর্চ'-এর আলো পড়ল। কারা যেন আসছে।

"ও আবার কারা?"

"অনুপ আর পত্রলেখা হবে বোধ হয়।"

"পত্রলেখা বাড়িতে ছিল না? তাই বলো!"

মদনবাবু বেফাঁস কথাটাকে সামলে নিলেন—"তাই আজ চা পাওয়া যায় নি এখনও।"

"এত রাত করে গিয়েছিল কোথায়?"

"নীলমণিবাবুর বাড়িতে আটকৌড়ে ছিল যে। ওঁর মেয়ের ছেলে হয়েছে জান না?"

নীলমণিবাবুর বাড়ির চাকর পত্রলেখাদের পৌছে দিতে এসেছে। হাতের ধামিতে আটকৌড়ের মুড়িমুড়কি আর জিলিপি।

"আটকৌড়ের খুব ঘটা দেখছি।"

"হ্যা-অ্যা।"

অনুপ দেখাল, তার হাফপ্যাণ্টের দুই পকেটই মুড়ি-কড়াই ভাজায় ভরা।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরই তো ছিল আসল নেমন্তন্ন। দিদি তো পেটুকের মত তোরই পিছনে পিছনে গিয়েছে।"

"সে আর বলতে হয় না। আমাকে ডাকতে এসেছে তবে গিয়েছি। নইলে আমার দায় পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করুন বাবাকে।"

"তোকে ডাকতে এসেছিল, সেও ভাইয়েরই খাতিরে। নইলে আটকৌড়ের কুলো পেটাবার জন্য মেয়েদের আবার ডাকে নাকি।"

"আচ্ছা বেশ, আমি পেটুক। হ'ল তো?"

"এই রে পত্রলেখা চটেছে। আরে তোকে চটালে কি আমাদের চলে। এই ছাখ্‌না, তুই আজ ছিলি না, তাই আমরা এখনও চা পাইনি।"

"এই নিয়ে এলাম ব'লে।"

পত্রলেখা বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল হাসতে হাসতে।

"এই সেদিন বিয়ে হ'ল না নীলমণিবাবুর মেয়ের?" একটু চাপা গলা মাধববাবুর। নেপাল কাছেই রয়েছে। ছেলেমানুষদের সম্মুখে এসব কথা যত না বলা যায় তত ভাল। তবে হ্যাঁ, নেপাল আর এখন ছেলেমানুষ নাই। এই মাস থেকে কলেক্টরীতে 'কপিস্ট'-এর কাজ পেয়েছে। চাকরি বাকরিতে ঢুকলেই ছোটরা বড়দের সঙ্গে সমান হবার অধিকার পায়। তবুও প্রথম প্রথম একটু বাধে। কাল প্রথম দোলগোবিন্দবাবু নেপালকে একটা গোপন কাজের ভার দিয়ে, তার বড় হবার অধিকারের সুনিশ্চিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে খবর আড্ডার অন্য বন্ধুদের জানা নেই, তাই তাঁরা গলার স্বর একটু নামিয়ে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ। নেপাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ছে।

"শ্রাবণ মাসে।"

"হ্যা-অ্যা।"

"আর আজকে হ'ল এ মাসের তেইশে।"

"হ্যাঁ।"

আঙুলের কর গোনা শেষ হ'লে দোলগোবিন্দবাবু বললেন—"যাকগে, যেতে দাও ওসব কথা।

সকলেই দোলগোবিন্দবাবুর এ স্বভাবের কথা জানে। পরকুৎসা শোনবার আগ্রহ তাঁরই বোধহয় দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। শাঁসটুকু নিয়ে ছিবড়েটাকে যথাসময়ে বাদ দিয়ে দিতে তিনি জানেন। তাই আসল কথাটা শোনা হয়ে গেলে, তিনি মৃদু আপত্তি তুলে বলেন—'থাক, থাক,—কি দরকার আমাদের এইসব পরের কথার মধ্যে থাকবার।'

তাঁর এই বারণ কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবু এই কম-কথার আড্ডাটা আপন নিয়মে কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে যায়।

ভিতর থেকে পত্রলেখা সকলের জন্য আটকৌড়ের মুড়ি-কড়াই ভাজা নিয়ে এল।

"দেখুন কাকা, কে পেটুক—আমি না আপনারা।"

"আরে তোকে কি কখন আমরা পেটুক বলতে পারি। তা হ'লে তো আমাদের চা-ই দিবি না আজ।"

"মা চা ঢালছে। এই এনে দিলাম ব'লে। নেপালদা' তুমি হুট করে চলে যেওনা যেন রাগ করে। তোমার মুড়ি নিয়ে আসছি। হাত তো আমার মোটে দুখানা। একসঙ্গে কতগুলো বাটি আনবো?"

"পত্রলেখা, একটি লঙ্কা আনিস তো মা আসবার সময়।"

"আচ্ছা, কাকা।"

তাঁর বন্ধুরা কেমন অনায়াসে মেয়েদের মা ব'লে সম্বোধন করেন, দেখে দোলগোবিন্দবাবু অবাক হয়ে যান। তিনি তো চেষ্টা করেও পারেন না। বাধো বাধো ঠেকে। একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। পত্রলেখা নামটা যা বড়—অনেক সময় যেন মনেই পড়তে চায় না। মা মা বলে ডাকতে পারলে সুবিধা ছিল। পত্রলেখার অন্য কোন ছোট ডাকনাম দেবারও উপায় নাই; স্ত্রীর কড়া হুকুম মেয়েকে পত্রলেখা বলেই ডাকতে হবে। তিনি নিজে এই পাড়ারই মেয়ে—ডাকনামেই আজও পরিচিত—ভাল নামটা কেউই জানে না—ডাকনামটা আবার বিশেষ ভাল নয়—তাই পত্রলেখার নাম সম্বন্ধে তাঁর এত সতর্কতা।

পত্রলেখা নামটায় দোলগোবিন্দবাবুর প্রথম থেকে আপত্তি। বলেছিলেন যে, যদি লেখা দেওয়া নামই রাখতে হয় তবে সুলেখা, বা চিত্রলেখা রাখ না কেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে কি তাঁর কোন কথা খাটে। যে কথা একবার মুখ থেকে বার হবে, তার আর নড়চড় হবার জো নাই। পাড়ার মেয়ে—ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন তো তাকে। আর যার নিজের নাম দোলগোবিন্দ তার কি পত্রলেখা নামটাকে বড় বলবার মুখ আছে?

কথার খই ফুটোতে ফুটোতে পত্রলেখা চা দিয়ে গেল।

"এবার তুমি পড়তে বসগে যাও পত্রলেখা।"

"ও কি হে নেপাল, তুমি যে একগাল করে মুড়ির সঙ্গে এক চুমুক করে চা খাচ্ছ। মুড়ির মুচমুচে ভাবটা চা দিয়ে নষ্ট করে লাভ কি?"

"আমার তাই ভাল লাগে।"

"হ্যা-অ্যা। আপ রুচি খানা।"

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন পাড়ার ইউনিভার্সাল মাসিমা। এঁর জিভের ধার আছে। আর কোন খবর ইনি এগারটার সময় শুনলে, সে খবর এগারটা বেজে দশ মিনিটের মধ্যে পাড়ার সব বাড়িতে অবধারিত পৌঁছে যাবে, এইরকম একটা খ্যাতি তাঁর আছে এখানে।

"কিসের গল্প হচ্ছে ছেলেদের?"

"ও আপনি এখানে ছিলেন? হচ্ছে এইসব হাবিজাবি কথা। আচ্ছা চা দিয়ে ভিজিয়ে নিলে মুড়ি চিঁড়ে ভাজার মুচমুচে ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় না?"

"দাঁতই নেই, তার আবার মুড়ি খাওয়া। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আমার এখন। তবে যেকালে খেতাম তখন মুড়ির সঙ্গে শশা খেতে আমার ভালই লাগত। মুড়ির মুড়মুড়ে ভাবটা শশার জন্য নষ্ট হয়ে যেত বলে তো বোধ হয় না।"

"তা হ'লে দেখছি নেপালেরই জিৎ।"

"হ্যা-অ্যা, ওরই জয়জয়কার আজকাল।"

"শুনতে পাচ্ছি তো তাই। আচ্ছা, আমি এখন চলি।"

"বড় তাড়াতাড়ি চললেন?"

"এসেছি কি এখন? জপসন্ধ্যা আমার এখনও বাকি।"

"আরে দাঁড়ান দাঁড়ান। এই অন্ধকারে একা যাবেন কি। নেপালের চা খাওয়া শেষ হল বলে। ও পৌঁছে দিয়ে আসুক আপনাকে।"

"না না, ও এখন অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে চা খাবে। কি বলিস নেপাল? আমার আবার কোথাও যাবার জন্য লোক লাগে নাকি? কাশী বৃন্দাবন সেরে এলাম একা; এ পাড়া থেকে ও পাড়া যেতে লোক লাগবে সঙ্গে?"

"না না। নেপাল সঙ্গে যাক।"

"ও বেচারা এসেছে খবরের কাগজ পড়তে—তোমরা ওকে জোর করে পাঠাবে ফোকলা-দিদিমার সঙ্গে।"

"ও কাগজ ওর পড়া। এখন এমনি নাড়াচাড়া করছে।"

"হ্যা-অ্যা, রিভাইজ করছে।"

"ইংরাজী করে আবার কি বলা হল? এসব কি আমরা বুঝি। ওসব বুঝবে পত্রলেখার মত আজকালকার ইংরিজী পড়া মেয়েরা। আচ্ছা আমি চলি। নেপাল তুমি খবরের কাগজ পড়।"

"পড়া না হয়ে থাকে, কাগজখানা বাড়িতেও তো নিয়ে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ—অ্যা।"

এতক্ষণে নেপাল কথা বলল। আর চলে না চুপ করে থাকা।

"আমার কাগজ-পড়া হয়ে গিয়েছে। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান মাসিমা। একটা কথা। নীলমণিদার নাতি দেখতে গিয়েছিলেন তো? কেমন হয়েছে?"

"দিব্বি বড়-সড় ছেলে।"

প্রশ্ন ও উত্তর দুইই চাপা গলায়। দুইই অর্থপূর্ণ। এর চেয়ে সংক্ষেপে বলা যেত না।

"থাক্ থাক্ ; যেতে দাও, দরকার কি ওসব পরের বাড়ির কথায়।"

নেপাল খবরের কাগজখানা সযত্নে ভাঁজ করছে।

বাড়ির ভিতর থেকে দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর চীৎকার শোনা গেল—"চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড় পত্রলেখা! অঙ্ক-টঙ্ক এখন নয়। ওসব চালাকি আমি ঢের বুঝি, বুঝলি।"

"এতক্ষণে শক্ত পাল্লায় পড়েছে পত্রলেখা।"

"হ্যা-অ্যা।"

পত্রলেখা জোরে জোরে ইতিহাস পড়া আরম্ভ করেছে।

"বাপের নাম দোলগোবিন্দ, মায়ের নাম খেঁদি, মেয়ের নাম হল, কিনা পত্রলেখা! হেসে বাঁচি না। নেপাল, আর কেন—চল্ এবার আমরা যাই। তোর দরকার থাকে তো আবার না হয় ফিরে আসিস এখানে, আমাকে পৌঁছে দিয়ে।"

"হ্যা-অ্যা।"

"না না না —আমি আর আসব না—ওই দিক দিয়েই বাড়ি চলে যাব।"

বেশ জোরের সঙ্গে বলা। বোঝা গেল যে এতক্ষণে নেপাল সত্যিসত্যিই মতস্থির করে ফেলেছে।

অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খবরের কাগজখানা দোলগোবিন্দবাবুর হাতে দিয়ে নেপাল বারান্দা থেকে নেমে এল। তিনিও নিস্পৃহভাবে বাঁ-হাত বাড়িয়ে অকিঞ্চিৎকর জিনিসটাকে নিলেন। বুঝে গিয়েছেন তিনি, কাগজখানা বাড়ির ভিতরে না রেখে নেপাল তাঁর হাতে দিল কেন। বুদ্ধিমান ছেলে নেপাল।......

কারও মুখে একটাও কথা নাই। মাসিমার গলার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, তারপর আর শোনা গেল না। নির্বাক আড্ডায় একজন পা

দোলাচ্ছেন, একজন আঙুলের কর গুনছেন, একজন আঙুল মটকাচ্ছেন। এ সবই প্রত্যাশিত আচরণ, হিসাব করবার সময়ের। গুনে, হিসাব করে একটা সঠিক তারিখ বার করবার গুরু দায়িত্ব এখন এঁদের মাথায়। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের তারিখটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, আর এখন এঁদের উপায় নাই। চুপ করে আছেন ব'লে যে এঁরা সময় নষ্ট করছেন তা নয়।

"সেটা ছিল উনিশে আগস্ট। ঠিক মনে পড়েছে।" তারিখের হিসাব মদনবাবুর সব সময় নির্ভুল। সেইজন্য কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করল না।

"যেতে দাও ওসব কথা।"

"হ্যা-হ্যা"

এর চেয়ে বেশী কথা খরচ করতে কেউ রাজী না। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। দোলগোবিন্দবাবু নেপালের দেওয়া খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামান নি, তখন থেকে। রোলারের মত গোল করে পাকিয়ে নিয়েছেন কাগজখানাকে।

মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে মুখে না প্রকাশ পেয়ে যায়, এ সংযম এঁদের প্রত্যেকেরই আছে। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের সঠিক তারিখটা খুঁজে বার করবার মধ্যে অঙ্কর উত্তর মিলবার তৃপ্তি নাই। ওটা শুধু কৌতূহল জাগ্রত করবার প্রথম ধাপ। তার পরের প্রশ্ন, ও উত্তরটাই যে আসল। সেইটা আসছে—এইবার আসছে! এই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা অতি সংক্ষিপ্ত সারকথা খোঁজবার পালা এখন চলেছে। কার মুখ থেকে সেই কথার নির্যাসটা বার হবে প্রথম, তার এখনও ঠিক নাই। দোলগোবিন্দবাবু পা নাচাচ্ছেন।—তিনি যখনই খুব বিচলিত হয়ে পড়েন তখনই এমনি করে পা নাচান। এই রকম অবস্থায়, তিনি অনেক সময় ভুলে পরনিন্দা করে ফেলেন।

তবে কি ছোট্ট টিপ্পনীটা, তাঁর মুখ থেকেই বার হবে? তাঁর অবিরাম পা-নাচানো লক্ষ্য করে বন্ধুরা সেই প্রত্যাশাই করছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অন্যরকম। অতিপরিচিত ভঙ্গীতে দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কটা বাজল ?"

অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ব্যাপার কি ? সবে আজকের আড্ডাটা জমে আসছিল। বন্ধুরা জানেন যে ওই প্রশ্ন, দোলগোবিন্দবাবুর নোটিশ—আড্ডা ভাঙ্গবার। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্তই এ আড্ডার মেয়াদ। দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর হুকুম। স্ত্রীর কথা না শুনে চলবার সাহস তাঁর নাই। শাসন বড় কড়া। পত্রলেখার পড়াশোনায় একটু মন কম ; তার লেখাপড়ার একটু দেখাশোনা না করলে গিন্নী রাগারাগি করেন।···"অঙ্ক না হয় তোমার মাথায় ঢোকে না ; অন্য বিষয়গুলোতো পড়াতে পার ! আর কিছু না হ'ক বানান-টানানগুলোও তো একটু দেখিয়ে দিতে পার। না-ও যদি পড়াও, কাছাকাছি একটু বসে থাকলেও তো মেয়েটা নভেল নাটক না পড়ে, পড়ার বইটই নাড়াচাড়া করে। মেয়েকে ঢুলতে দেখলে চোখে জলের ঝাপটাও তো দিয়ে আসতে বলতে পার। আমি থাকি সে-ই রান্নাঘরে···"

এই সব মুখ ঝামটার ভয়ে সাড়ে আটটার সময় আড্ডা ভাঙ্গতে হয় প্রতিদিন। খাওয়া রাত দশটায়। তার আগে কিছুতেই না—মরে গেলেও না। এই হচ্ছে পত্রলেখার মায়ের ব্যবস্থা।

এই সব ব্যবস্থার কথা দোলগোবিন্দবাবুর বন্ধুদের সকলেরই জানা। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, আজকে যেন সাড়ে আটটা বড় তাড়াতাড়ি বেজে গেল। অবশ্য তাঁদের কারও কাছেই ঘড়ি নাই—তবে একটা আন্দাজ আছে তো সব জিনিসেরই। দোলগোবিন্দবাবু যেন একটু উসখুস করছেন। এ জিনিস বন্ধুদের নজর এড়ায় না।···কেন ?··· মেয়ের পরীক্ষার সময় এখনতো নয়। কোন কথা না বলে বন্ধুরা উঠলেন। যাবার আগে দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখ আর একবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে গেলেন।

"হ্যা-অ্যাঁ।"

শুধু এই কথাটা জুতো পরবার সময় একজনের মুখ থেকে অজানতে বার হয়ে গেল।

এতক্ষণ দোলগোবিন্দবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের খবরের কাগজখানা খুলবার সময় পেলেন।···ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। ছেলেটার বুদ্ধি আছে! পারবে। এ ছেলে পারবে। কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় এ সব ছেলেকে!···এদের হাতে রাখতে পারলে লাভ আছে।

খবরের কাগজের ভাঁজের ভিতর, টাইপ করা চিঠি, আর একখানা খাম। খামের ঠিকানাটাও টাইপ করে লেখা···এত তাড়াতাড়ির মধ্যেও ছেলেটার মাথায় বুদ্ধি খেলেছে খুব!···

টাইপ করবার জন্য, কাল রাত্রিতে নিজের লেখা খসড়াটা দিয়েছিলেন নেপালের কাছে। নেপাল ফৌজদারী আদালতে কপিস্ট-এর পদে বহাল হয়েছে নতুন। তার কাছে সব কথা খুলে বলেছিলেন। প্রথমে বুঝতে পারেনি নেপাল ব্যাপারটা। 'দশের উপকার', 'অপ্রিয় কর্তব্য', ইত্যাদি কথাগুলো দোলগোবিন্দবাবুর মত অল্পকথার মানুষের মুখে শুনে প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা লেগে গিয়েছিল তার। তার উপর আবার ফিস-ফিস করে বলা। পর মুহূর্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল আগাগোড়া জিনিসটা। গলা নামিয়ে সে বলে—"এ আর একটা শক্ত কাজ কি কাকাবাবু। কিছু ভাববেন না। মেসিন বাড়িতেও নিয়ে আসতে পারি যদি দরকার পড়েতো। যখন যা দরকার লাগবে বলবেন কাকাবাবু।"

"না না আমার নিজের আবার দরকার কি। পাবলিকের উপকারের জন্যই এ কাজ করা।"

"সে তো বটেই।"

এই হয়েছিল কালকের কথা। নেপাল পত্রলেখার বাবার আস্থাভাজন হতে পারবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সম্বন্ধে বেনামী চিঠি হাতে না

লিখে, টাইপ করে পাঠানই সব দিক বিবেচনা করে, যুক্তিযুক্ত নিজের অফিসের মেসিনে টাইপ করা নিরাপদ নয়। তাই নেপালের সাহায্য নেবার দরকার হয়েছিল।

বেনামী চিঠি পাঠানো দোলগোবিন্দবাবুর পক্ষে নতুন না। এ তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যস্ত বিলাস। স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে কত বেনামী চিঠি যে তিনি আজ পর্যন্ত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তাঁর এই কাজ সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু মনে মনে জানেন কেন লেখেন। এর মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত আনন্দ পান। দুর্বার এর আকর্ষণ। পরকুৎসা করবার, বা শোনবার রসটা মিষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু এর তুলনায় পানসে। এটাকে শুধু আড়াল থেকে খুন-সুড়ি করে, মজা উপভোগ করা ভাবলে ভুল হবে। এ হচ্ছে ক্ষমতা-সচেতন মেঘনাদের, মেঘের আড়াল থেকে নিজের অস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা। শিকারের উপর বেনামী চিঠির প্রতিক্রিয়ার কথাটা কল্পনা করেই সব চেয়ে বেশী আনন্দ; সেটা নিজের চোখে দেখতে পেলেতো কথাই নাই। এই ঘন রসের নেশা তাঁর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তিনি। প্রথম বয়সে স্কুলের পায়খানার দেওয়ালে লিখতেন। তারপর আরম্ভ করেছিলেন রাতদুপুরে শহরের দেওয়ালে আর ল্যাম্পপোস্টে কুৎসা-ভরা প্ল্যাকার্ড আঁটা। কিন্তু ও সবের স্বাদ কিছুদিনের মধ্যে ফিকে মনে হয়েছিল। ওর রস, প্রচারে; চটকদার কুৎসার কথাটা দশ জনে মিলে উপভোগ করে। কিন্তু বেনামী চিঠি দেবার আনন্দের জাত আলাদা; একা উপভোগ করবার অধিকারের আমেজ অনেক বেশী গভীর। তাই তিনি ক্রমে ও সব ছেড়ে এই পথ ধরেন। এ পথে বিপদ-আপদও অপেক্ষাকৃত কম।

এই নিরাপত্তার দিকে চিরকাল তাঁর দৃষ্টি সজাগ। তাঁর বেনামী চিঠি দেবার কোন কথা বন্ধুরাও জানেন না। কারও সঙ্গে তিনি কখনও আলোচনা করেননি এ সব কথা। কাউকে বিশ্বাস পাননি।

ও সব বিষয়ে কখন কোন কথা উঠলে, তিনি চিরকাল একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতার ভাব দেখাতে অভ্যস্ত। জানেন এক শুধু তাঁর স্ত্রী— তাও সবটা নয়, কিছু কিছু। যত লুকিয়েই নেশা কর না কেন, স্ত্রীর কাছে কোন না কোন সময় সেটা ধরা পড়তে বাধ্য। চাবি-দেওয়া দেরাজের মধ্যে চিঠি লিখবার সরঞ্জাম, আর ডাকটিকিটের প্রাচুর্য দেখেই তাঁর স্ত্রীর মত বুদ্ধিমতী মহিলা হয়ত অন্য একটা মনগড়া মানে করে নিতেন। তাই তিনি তাঁর সমাজসেবার নিজস্ব ধারার কথাটা স্ত্রীকে জানিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা হল। বেনামী চিঠিও আবার নানারকমের আছেতো। দরকার পড়েছিল সেদিন একখানা মেয়েমানুষের হাতে-লেখা বেনামী চিঠির। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্ত্রীকে বলতেই দেখা গেল যে এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও তৎপরতা প্রচুর। একবার জিজ্ঞাসাও করেন নি এ কাজে কোন বিপদ আছে কিনা। সম্মতিজ্ঞাপক মৃত্ব আপত্তি জানিয়ে, পরার্থে, গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে, স্বামীর দেওয়া 'ডিক্টেশন' লিখেছিলেন। লেখা শেষ হলে রসিকতা করে বলেছিলেন—"পাড়ার মধ্যে হয়েছিল বিয়ে আমাদের। বরের চিঠিও কোন দিন পাইনি ; বরকে চিঠি লেখবার সুযোগও কোন দিন হয়নি। চিঠি লেখার পাটই আমার নাই। যাক ফাঁকি দিয়ে সুযোগ পেয়ে গেলাম জীবনে প্রেমপত্র লিখবার।"

আর গুণের মধ্যে বেনামী চিঠির কথা পাড়ার অন্য কারও কাছে বলে না ফেলবার মত বুদ্ধি আছে, তাঁর স্ত্রীর।

এখন কথা হচ্ছে যে, নেপালটারও সে সুবুদ্ধি আছে কিনা। নেপালকে বিশ্বাস করে তিনি ভুল করলেন কিনা সেই কথাটাই কালকে থেকে তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। তবে আজকে খানিক আগেই নিজের আচরণে নেপাল যা দেখিয়েছে তাতে মনে হয় তাকে বিশ্বাস করতে পারা যায়।

যাক সে সব যা হবার তা তো হয়েইছে। এখন তাঁর হাতে অনেক কাজ। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত টাইপকরা

চিঠিখানা দেখেশুনে এখনই ঠিকঠাক করে রাখতে হবে ; নইলে ভোরে উঠে মাইল চারেক দূরের ডাকবাক্সে চিঠিখান ফেলে আসতে পারবেন কি করে। এ পাড়ার পোস্ট অফিসের ছাপ চিঠিখানার উপর কোন মতেই পড়তে দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আবার একটা নতুন কাজ হাতে এসে পড়ল হঠাৎ, আজকের সান্ধ্য আড্ডার গল্প থেকে। নীলমণিবাবুর মেয়ের 'কেসটা'। এই রকমই হয় ; কোন দিক থেকে যে কখন কাজের বোঝা মাথায় এসে পড়ে তার কি ঠিক আছে ! যখন আসে, তখন যেন অনেকগুলো একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে পড়ে—এ তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন। এখন নীলমণিবাবুর নামে একখানা বেনামী চিঠি ছাড়তেই হয়। নতুন জামাইএর কাছে এখন নয়। সে সব হবে পরে দরকার বুঝলে—একটা সতর্কবাণীর মধ্যে দিয়ে। এখন শুধু নীলমণিবাবুকে দিতে হবে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত। প্রথম চিঠিতে তার চেয়ে বেশী কিছু দেবার প্রয়োজন হবে না। একসঙ্গে বেশী না। নিংড়ে নিংড়ে একটু একটু করে এসব আনন্দের রস নিতে হয়। কোণঠাসা প্রাণীটা এখন সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। আঘাত খাওয়ার পর আহত শিকারটার চোখের মণিদুটোকে তাঁর বড় দেখতে ইচ্ছা করে ; ভয়ার্ত বুকের অসহায় স্পন্দন আঙুলের ডগায় নিতে ইচ্ছা করে।······জামাইএর চিঠিখানাও এখনই দিয়ে দিলে কেমন হয় ?···কিন্তু ঠিকানা যে জানা নাই। মদনবাবুর এসব মুখস্থ। কথায় কথায় জেনে নিলেই হত আজ। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।···

দোলগোবিন্দবাবু উঠলেন, ঘরের ভিতর যাবার জন্য। পত্রলেখা ছুটে আসছিল এই দিকেই—হাতে বই।

"নেপালদা ! এ কি নেপালদা চলে গিয়েছে ?"

"হ্যাঁ সে তো মাসিমার সঙ্গে গেল। কেন রে ?"

"লাইব্রেরীর বইখানা আজ ফেরত দেবে বলেছিল।"

নেপালই নিয়মিত লাইব্রেরী থেকে বই এনে দেয় এ বাড়িতে

"যাক, কালকে ফেরত দিলেই হবে। বইখানা দে তো দেখি একবার।"

"এ বই তোমার পড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।"

"না, সেজন্য চাচ্ছি না। বইখানা বেশ লম্বা সাইজের আছে। দুচারখানা অফিসের চিঠি লিখতে হবে; ওই বইখানার উপর কাগজ রেখে লিখবার বেশ সুবিধা।"

"দাঁড়াও আমি বড় প্যাডখানা এনে দিচ্ছি।"

"না না, এতেই হবে। তুই শীগগির পড়তে বসগে যা। নইলে তোর মা এখনই আবার বকাবকি আরম্ভ করবে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বি, বুঝলি। আর তোর কলমটা দিয়ে যাস তো।"

এ সব কাজে নিজের কলম ব্যবহার না করে অপরের কলম ব্যবহার করাই ভাল।

পত্রলেখা কলমটা দিয়ে যাবার সময় একখানা লম্বা গোছের খাতাও আনে।

"লাইব্রেরীর বই; ছিঁড়ে-ছুঁড়ে যাবে; তার চেয়ে এই খাতাখানার উপর কাগজ রেখে লেখাপড়া কর।"

"লাইব্রেরীর বই ছিঁড়বে কেন। আমি কি বইয়ের সঙ্গে কুস্তি করতে যাব। যা পড়তে বসগে যা। তুই দেখছি আমাকেও আজ বকুনি না খাইয়ে ছাড়বি না।"

মেয়ে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। কথাগুলো বোধ হয় একটু কড়া হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে তিনি কোন দিনই বকতে পারেন না। শুধু মেয়েকে কেন, কাউকেই না। বকা, চীৎকার করা এ সব তাঁর কোনকালেই আসে না।

চাবি দিয়ে তাঁর প্রাইভেট দেরাজ খুলে, তিনি লেখাপড়ার কাগজপত্র বার করলেন। একে তাঁর স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, কুনোব্যাঙের দপ্তর খুলে বসা। খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট, কাগজ—বহু রকমের কালি আরও অনেক দরকারী জিনিসের তাঁর স্টক থাকে, কখন কাজে লাগবে

বলাতো যায় না। বেনামী চিঠি পাঠাবার দিনে ও সব কেনা, ঠিক না। নেপালের চিঠিখানা তিনি ভাল করে পড়লেন। দুচারটে বানানে ভুল করলেও মোটামুটি মন্দ টাইপ করেনি নেপাল। ভুলগুলো কালি দিয়ে সংশোধন করা ঠিক হবে না—কে জানে কিসে থেকে কি হয়। খামখানা থুতু দিয়ে আঁটবার সময় চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই সরকারী কর্মচারিটির ছবি। অপ্রত্যাশিত আঘাতে কেমন করে ছটফট করে বেড়াবে, অথচ কাউকে কিছু বলতেও পারবে না—এ কথা ভেবেও আনন্দ।...লোকটার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।......

"চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়, পত্রলেখা।"

এইবার দোলগোবিন্দবাবু দ্বিতীয় চিঠিখানা লিখতে বসলেন। অপ্রতিহত তাঁর ক্ষমতা এখন। পুতুল নাচের সূতো তাঁর হাতে; যেমনভাবে ইচ্ছা নাচাতে পারেন। আজকের হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়া দায়িত্ব; সর্বাধুনিক কিনা, তাই এইটাই আজকের আসল কাজ। তিনি একখানা খামের উপর খসখস করে বাঁ হাত দিয়ে নীলমণিবাবুর ঠিকানাটা লিখলেন। অভ্যস্ত হাত। তারপর আরম্ভ হল চিঠি লেখা। কলম হাতে ধরলে কখনও কথার জন্য ভাবতে হয় না তাঁকে। কিন্তু আজ প্রথমেই আটকাল একটা বানানে। আরম্ভ করেছিলেন—"আমরা ঘাস খেয়ে থাকি না। লোকের চোখে ধুলো—

খটকা লাগল ধুলোর বানানে। ধ এ দীর্ঘউ না ধ এ হ্রস্বউ? এইটা দেখবার জন্য পত্রলেখার কাছ থেকে বাংলা অভিধান-খানা চাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ হল। লাইব্রেরীর বইয়ের মলাটের উপর ধুলো আর ধূলো দুটো পাশাপাশি লিখে দেখলেন কোনটা দেখায় ভাল। দুটোই সমান যে!... যদি ধুলো কথাটা পাওয়া যায় এই ভেবে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাতা ওলটাতে আরম্ভ করলেন।... বঙ্কিম চাটুজ্যে কি আর ধুলোটুলো নিয়ে কারবার করে! গোধূলি, ধূলি, ধূলিকণা এই সব গোটা কয়েক পাওয়া গেল; কয়েক পৃষ্ঠার পর হাল ছেড়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বইখানা নাড়াচাড়া করছেন—একখান

কাগজ বেরিয়ে এল। কতদূর পর্যন্ত পড়া হল, তারই বোধহয় চিহ্ন। দিয়েছিল লাইব্রেরীর কোন পাঠক ওই কাগজখানাকে দিয়ে।...কাগজখানার উপরের লেখাটার দিকে নজর গেল।... এ কি! পত্রলেখার হাতের লেখা না?... লেখাটা পড়লেন। প্রথমটায় একটু গোলমেলে ঠেকে। চিঠিখানার নীচে কোন নাম নাই। কাকে লেখা তারও কোন উল্লেখ নাই চিঠির ভিতরে। চিঠিখানা তাড়াতাড়িতে লেখা—মনে হয় খানিক আগেই লেখা হয়েছে।

—সন্ধ্যার সময় বাড়িতে থাকতে পারিনি। ছোট ভাইকে নিয়ে মার হুকুমে আটকৌড়েতে যেতে হয়েছিল। আমার যেতে একটুও ইচ্ছা ছিল না। রাগ করনা লক্ষীটি।—

শেষের শব্দটার ভুল বানান এই মানসিক অবস্থাতেও নজরে পড়ে।...না...অসম্ভব! আবার পড়ে দেখলেন।...রাগে সর্বশরীর রি রি করে উঠে। নিজের মেয়ের এই কাজ। ইচ্ছা হয় চুলের ঝুঁটি ধরে এখানে টেনে নিয়ে এসে মেয়ের এই আচরণের জবাবদিহি নেন!

চীৎকার করে মেয়েকে ডাকতে গিয়ে মনে হ'ল যেন হঠাৎ মেয়ের নামটাই মনে পড়ছে না; কেমন যেন গুলিয়ে গেল। পরের মুহূর্তে নামটা খুঁজে পেলেন। পত্রলেখাকে তিনি আজ পর্যন্ত কখন বকেননি। মার-ধর, বকুনি, ও সব তাঁর আসে না কোন কালে। বলেছেন ও সব হচ্ছে ওর মায়ের ডিপার্টমেণ্ট।...তা ছাড়া মেয়ের কাছে কি কখন ও সব কথা তিনি বলতে পারেন।...

সব রাগ গিয়ে পড়ল ভিজে-বিড়াল ন্যাপলাটার উপর। ওটার উপর বিশ্বাস করে তিনি কি ভুলই না করেছেন!...মা বাপেরই বুঝি এ সব জিনিস নজরে পড়ে সব চেয়ে শেষে! এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে আজ সন্ধ্যার আড্ডায় বন্ধুদের কথাগুলোর ইঙ্গিত এই দিকেই ছিল। মাসিমা পর্যন্ত নেপালের এত মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার উপর কটাক্ষ করতে ছাড়েননি দেখা যাচ্ছে সকলেই জানেন,

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন; সকলে ঘুরিয়ে তাঁকেই খোঁটা দিচ্ছিলেন এ নিয়ে। অথচ শুধু তিনিই বুঝতে পারেননি সে সময়। এর আগে ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে।…ছি ছি ছি!…ওই হতভাগাটাকে মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে; ওর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করতে হবে; করতে হবে তো আরও কত কি! কিন্তু তাঁর যে ও সব আসে না কোন কালেই! পৃথিবীর যত ঝঞ্ঝাট কি তাঁরই উপর এসে পড়বে!…ওই বাঁদরটাই নিশ্চয় পত্রলেখাকে বইয়ের মধ্যে রেখে চিঠি পাঠানর ফন্দিটা শিখিয়েছে! ও চালাকিটা আগে থেকে রপ্ত না থাকলে, কখনও কি অত তাড়াতাড়িতে খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে ভরে চিঠি চালান দেবার কথাটা কারও মাথায় খেলে? ধরে চাবকানো উচিত রাস্কেলটাকে!…কিন্তু মারধর করলে নেপালটা আবার চটে তাঁর বেনামী চিঠি দেবার অভ্যাসের কথা লোকের কাছে বলে বেড়াবে না তো? তাঁর নিজের হাতে লেখা চিঠির খসড়াটাও যে সেই হতভাগাটার কাছেই থেকে গিয়েছে!…ভয় ভয় করে।

কী করা উচিত এখন? অনেকক্ষণ ধরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন বিষয়টাকে নানা দিক থেকে। যত ভাবেন তত মাথা গরম হয়ে ওঠে। কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত পত্রলেখার বাবা তাঁর দেরাজের থেকে একটা পুরনো পেনহোল্ডার বার করলেন। কলমটায় নিব নাই। কলমের উলটো দিকটা কালির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তিনি লিখছেন। লিখছেন নতুন একখানা চিঠি। বেনামী চিঠি। পত্রলেখার মায়ের কাছে। জীবনে স্ত্রীর কাছে তাঁর এই প্রথম চিঠি লেখা।

কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ

রেল-গুমটির লোকটা অমন করে তাকাল কেন? একটু কেমন কেমন যেন লাগল মিসেজ মুখার্জির। ঝুঁকে আদাব করেছে ঠিকই; কিন্তু আদাব করবার সময় হেসে 'আদাব মেম সাহাব' বলেনি—অন্য দিনকার মত। ট্রেন আসছে। একদিককার গেট বন্ধ করে সে অন্য দিককারটাও বন্ধ করতে যাচ্ছিল; এমন সময় মুখার্জি সাহেবের গাড়ী আসতে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়। হাতের গোটানো নিশান-টাকে বার কয়েক ঘন ঘন নেড়ে মোটরগাড়ীর ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি গাড়ী বার করে নিয়ে যেতে ইশারা করে। ড্রাইভার আশ্চর্য হল। কর্তব্যনিষ্ঠ 'গুমটিম্যান'টির এ ধরণের বিচ্যুতি সে আগে কখনও দেখেনি। যাক, ভালই হল। একে মেমসাহেবের মেজাজটা আজ সপ্তমে চড়ে রয়েছে; তার উপর গুমটির গেটে দশ মিনিট দাঁড়াতে হলে হয়েছিল আর কি! ওঁর মেজাজের কথা এখানকার কে না জানে। তাই না রেল-কলোনির লোকে ওঁর নাম রেখেছে 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'।

কিন্তু গুমটিম্যান অমন করে তাকাল কেন?…

রেল লাইন পার হয়েই আরম্ভ হয় রেলের অফিসারদের সারি সারি বাংলো। এ রাস্তায় লোক চলাচল সাধারণত কম। আজ যেন সে আন্দাজে একটু বেশী বোধ হচ্ছে!…

ডলি ব্যস্ত নিজের সমস্যা নিয়ে।

"মা, ক্যামেরাটা আজ বাবাকে দেখাব?"

ড্রাইভার যাতে শুনতে না পায়, সেই জন্য গলার স্বর একটু নামিয়ে জিজ্ঞাসা করা। কথার সুরে একটা গোপন ষড়যন্ত্রের আভাস মা-মেয়ের মধ্যে, বাবার বিরুদ্ধে।

"কেন, দেখালে কি বাবা ধরে গলাটা কেটে ফেলে দেবে?"

বললেন বেশ চড়া গলায়। ড্রাইভার শুনতে পেল তো বয়ে গেল। চটলে শোভন অশোভনের জ্ঞান তাঁর কোন দিনই থাকে না।

এই উত্তরই ডলি চাচ্ছিল। এমনি করেই মা জব্দ করতে চায় বাবাকে, তা সে পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানে। একটা মায়ের দিক, একটা বাবার দিক—বাড়ীতে এই দুটো দিক। সে সব সময় মার দিকে। দাদা ছুটিতে বাড়ী এলে সেও মার দিকে। দুপুরে দেরী করে বাড়ী ফিরে, জানলা দিয়ে 'ইয়াঃ গোঁফ'এর ইশারা করে, মার কাছ থেকে জেনে নেয় বাবা এখন বাড়ীতে আছে কি না। সুনরা চাকরটা পর্যন্ত মার দিকে। বাবার দিকে ছিল এক শুধু দিদি। কিন্তু সে তো বিয়ের পর বিলাসপুরে চলে গিয়েছে জামাইবাবুর সঙ্গে। সুপুরি লবঙ্গ মুখে না থাকলে সিগারেট খেতে ভাল লাগে না বাবার। তাই দিদি মাঝে মাঝে বাবার জন্য সুপুরি কেটে পাঠিয়ে দেয় বিলাসপুর থেকে। কী পাতলা পাতলা সরু সরু করে সুপুরি কাটতে পারে দিদি। মাও পারে না ওরকম। দিদি ছাড়া আর কারও কাটা সুপুরি বাবার ভাল লাগে না। তাই রাগ করে মা কখন বাবার জন্য সুপুরি কেটে দেয় না। ফুরিয়ে গেলে সুনরাকে কেটে দিতে বলে বাবার জন্য। সুনরাটা যা ডুমো-ডুমো বড় বড় করে সুপুরি কাটে! বাবার জামা ধোপার বাড়ী দেবার সময় পকেট থেকে সেই বড় বড় সুপুরির টুকরোগুলো বার করে, মা সুনরাকে দেখায়—'ছাখো সাহেবের মুখে রোচেনি।'... সুনরাও মায়ের দিকে কিনা।...'ওমা! অত লোক কেন আমাদের বাড়ীতে?'...ডলিরই প্রথম নজরে পড়ল। শুনে তাকালেন ডলির মা।...সত্যিই তো! কেন? ফুলগাছের কেয়ারিগুলো আবার নষ্ট না করে দেয়। অফিসের কোন গোলমাল? কোন দরখাস্ত নিয়ে এসেছে বুঝি অফিসের বাবুরা। এই সবই চলেছে আজকাল!...পুলিসও আছে!... গম্ভীর...থমথমে!...গাড়ী ঢুকবার জায়গা করে দিল সরে দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় ওঠবার মুহূর্তেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। অন্য কেউ হলে এর আগেই বুঝত। চীৎকার করে

ছুটে গেলেন তিনি পাশের ঘরে—যেখানে সবাই রয়েছে। তাঁর ক্ষতির পরিমাণ তখনও ভাল করে ভেবে উঠতে পারেননি। ওদিক থেকে যে আঘাত আসতে পারে, সেকথা কোনদিন কল্পনাও করেননি। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন চাদর ঢাকা মৃতদেহটার উপর। দেহটাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—"আমাকে জব্দ করবার জন্য তুমি এ কি করলে গো!"...

রক্তের কালো ছোপের জায়গাটায় মাথা রেখে মিনিট কয়েক এই সুরে কাঁদবার পর থেমে গিয়েছিলেন হঠাৎ। দোষী মন। তাই খেয়াল হয়েছিল অন্য এক কথা। সঙ্গে সঙ্গে সেইটাই তার মুখ্য দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানকার এত লোকের চাউনির সেই কেমন কেমন ভাবটার মানে এতক্ষণে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। এই লোক-গিজগিজ বাড়ীর প্রত্যেকে তাঁর বিরুদ্ধে; একটা ক্ষণিক সহানুভূতির আবরণে তাঁর উপর আন্তরিক বিতৃষ্ণাটা আবছাভাবে ঢাকা পড়েছে মাত্র। যে লোকটা তাঁকে জব্দ করবার জন্য এমনভাবে চলে গেল, পৃথিবীশুদ্ধ সবাই তার দিকে! মুহূর্তের মধ্যে তিনিই যেন বাইরের লোক হয়ে গিয়েছেন নিজের বাড়ীতে।

মিসিজ মুখার্জি ধরেছেন ঠিকই।

খবরটা শোনামাত্র প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করেছে—কেন? ভদ্রলোক এমন কাণ্ড করতে গেলেন কেন?...অতবড় চাকরে। ভাল মানুষ। ঠাণ্ডা মেজাজ। হিসাবী। ঘোড়দৌড়, শেয়ার মার্কেট বা কোন বদখেয়াল নাই। গীতা পাঠ না করে জলস্পর্শ করেন না।...বয়স অল্প হলেও না হয় কথা ছিল; পঞ্চাশের উপর বয়স। ছেলে, মেয়ে, জামাই। ছেলে এখনও মানুষ হয়নি; এক মেয়ে এখনও ছোট। চাকরিতে সেদিনও একটা 'লিফ্‌ট' পেয়েছেন। শরীর ভাল—কোন রকম অসুখ-বিসুখের খবর কারও জানা নেই।...এহেন লোক এ কাণ্ড করতে গেলেন কেন?...

কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক শুধু হতে পারে ..

······হ্যাঁ হ্যাঁ বোধ হয় তাই। বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই তাই। পারিবারিক অশান্তি। 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'এর স্বভাব তো কারও অজানা নয়। রেলওয়ে কলোনির কোন খবরটা কার অজানা। গয়লা, ধোপা, মুদি, চাকর, আরদালী যার সঙ্গে ভদ্রমহিলার কারবার, তারই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। মুখ থেকে কোন একটা হুকুম বার করতে যেটুকু দেরি; সঙ্গে সঙ্গে হওয়া চাই। কী তিরিক্ষি মেজাজ! তেমনি নাক সিটকানো সবতাতে। ···আরে বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে হল তো কি হল? সেই দেমাকেই ধরাকে সরা জ্ঞান করে—স্বামীকে সুদ্ধ! বড়মানুষির বড়াই, তো বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকলেই পারিস! তবে বিয়ে করতে গিয়েছিলি কেন রেলের চাকরেকে অগ্নি-সাক্ষী করে? আরে তোর বাপের বনেদি বাড়ীতে এখন শুধু ওই বড় বড় নোনাধরা থামই আছে; তাও কোন মারোয়াড়ীর কাছে টিকি বাঁধা কে জানে; জানা আছে সব!···পড়তেন সেইরকম কোন মোগল স্বামীর পাল্লায় তো সব কম্যাণ্ডারগিরি বার করে দিত।···কে বলে একহাতে তালি বাজে না? যে বলে সে যেন একবার 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'কে দেখে যায়।···বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করা না তো হাতী পোষা। কী খরচে স্বভাব 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'এর। ওই খরচে বউ পোষা কি মাস গেলে মাইনে পাওয়া লোকের কম্ম—সে যত বড় চাকরেই হোক! তার উপর আবার মুখার্জি সাহেব মাস পয়লা মাইনে পেয়েই খানকয়েক মনিঅর্ডার পাঠাতেন দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনদের—অফিসের ঠিকানাতে রসিদ আসত—দেখেছে তো সবাই।···হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, টাকা-পয়সা নিয়ে কিছু নটখটি লেগে থাকবে। নইলে যে লোকটা অফিস থেকে বাড়ীতে এসে লাঞ্চ খেয়েছে, সেই লোকটা তার খানিক পরেই বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বন্দুকের গুলী চালিয়ে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?···পকেটের কাগজে লেখা ছিল—"আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। মলি, ডলি, প্রদীপ তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও। ডলির পূজার উপহারের

পার্সেল লোহার আলমারিতে আছে। আমার গীতাখানি যেন মলি নেয়।…

'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'এর নামোল্লেখ পর্যন্ত করেননি ভদ্রলোক শেষ চিঠিতে। এর থেকেই আন্দাজ করে নাও ব্যাপারটা।……

ওই সময়টুকুর মধ্যে একটা কিছু যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নাই। বাড়ীর লোক ছাড়া কে জানবে সে কথা। চাকর-বাকররা বলে কিছু জানে না।……

ফিসফিস করে কত কথা, কত সন্দেহ। কত ইঙ্গিত চোখে চোখে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলবার আছে; কিন্তু অত কথা বলবার সুযোগ এখানে কোথায়। সে সব হবে পরে, কম্পাউণ্ডের বাইরে গিয়ে। আজকের অঘটনের আসল কারণটা খানিকটা আঁচ করলেও সঠিক জানতে না পারার একটা অস্বাচ্ছন্দ্য সকলকে পীড়া দিচ্ছে।

নিগূঢ় অন্তর থেকে মিসিজ মুখার্জি জানেন যে, আজকের এই অঘটনের জন্য তিনি বহুলাংশে দায়ী। তবে এতটা গড়াবে সেকথা তখন ভাবতে পারেননি। এর চেয়ে কত বেশী কথা কাটাকাটি কত সময় তিনি করেন। নিজেকে নিগৃহীতা কল্পনা করে নিয়ে রাগারাগি করা তাঁর চিরকালের স্বভাব। এখন এই অবস্থাতেও রাগে গা-জ্বালা করে, যে লোকটা অন্য কারও কথা না ভেবে এমনভাবে চলে গেল, সেই লোকটার উপর।

মুখার্জি সাহেব মানুষটা অতি চাপা। আজও স্ত্রীর বাঁকা কথার পালটা জবাব দেননি। দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার পর অফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। স্ত্রীর খোঁচা-মারা কি একটা যেন কথায় মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। পকেট থেকে বার করে তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন চাবির রিংটা।

একরকম বলতে গেলে এই চাবিই তাঁদের সংসারের অশান্তির মূলে। স্ত্রীর বেহিসাবী স্বভাব দেখে বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, মাইনের সব টাকা এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া কোনদিন উচিত মনে

করেননি মুখার্জি সাহেব। দৈনন্দিন খরচের জন্য কিছু টাকা শুধু তাঁর হাতে দিতেন। এইটাই ছিল মিসিজ মুখার্জির প্রধান অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। যখন-তখন তিনি স্বামীকে শুনিয়ে দিতেন যে, বাপের দেওয়া টাকা তাঁর কিছু আছে, আর সেই টাকাই তিনি খরচ করেন নিজের দরকারে। স্ত্রীর এই কথা মিস্টার মুখার্জি কোনদিন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেননি; আর এ সম্বন্ধে জানতে ঔৎসুক্যও প্রকাশ করেননি কোনদিন।

এই মনকষাকষিরই একটা খণ্ড পর্ব আজকের চাবি ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটা। পালিশ-করা মেঝের উপর পড়ে ছিটকে চলে গিয়েছিল চাবির রিংটা ঘরের কোণার জলচৌকিটার নীচে। মিসিজ মুখার্জি সেদিকে ফিরেও তাকাননি। এর আগে কখন স্বামীর এমন রূঢ় ব্যবহার দেখেননি। এমনভাবে তাঁর দিকে চাবি ছুঁড়ে ফেলাও যা চাবি ছুঁড়ে মারাও তাই।···সব আভিজাত্য ভুলে গিয়ে ইতর অঙ্গভঙ্গি করে ওই চাবি, আর চাবির হাড়-কিপটে মালিকের টাকার উদ্দেশে বেশ কদর্য ভাষা ব্যবহার করেন। নিজের কপালকেও ধিক্কার দিতে ভোলেননি।···

টাকা জমানর দরকার বলে কি মনের মত পূজোর জামাকাপড়ও হবে না? এক প্রস্থ হয়েছে তো কী হল। একটার বেশী দুটো কিনলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি? দেখতে পারি না এই সব ছোট নজর! মেয়ের বিয়েতে পনের হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে বলে কি একেবারে গরীব হয়ে গিয়েছ? খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দাও, টাকা বাঁচবে! ঝাঁটা মারি অমন টাকায়! ভাগ্নীর বিয়ের খরচ, ভাইপোর মেডিকেল কলেজে পড়ার খরচ, সাতগুষ্টির লোকের জন্য মনিঅর্ডার, সব চলছে সাবেক-দস্তুর; শুধু যত অভাব আমি চাইলে! কে চায় তোমার পয়সা!···এই ড্রাইভার! গাড়ী বার করো!···

ডলি তখন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। দরজার বাইরে স্নুনরা হাঁ করে মেমসাহেবের কথাগুলো গিলছে। কাপড়-চোপড় বদলে ডলিকে নিয়ে বেরুবার সময় তিনি আড়চোখে দেখে গিয়েছিলেন যে মিস্টার

মুখার্জি তখনও নীচের দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছেন; মুখের সিগারেটটা ধরানো হয়নি। বাজারে কেনাকাটা সেরে, ঘণ্টাতিনেক পর বাড়ী ফিরে দেখেন এই কাণ্ড।

"আমাকে জব্দ করবার জন্য এ তুমি কি করলে গো!" "আমার কথা না হয় না ভাবলে, ছেলেমেয়েগুলোর কথাও কি একবার তোমার মনে পড়ল না গো!"...

প্রচণ্ড শোকের তোড়ে আপনা থেকে বেরিয়ে আসছিল কথাগুলো ডুকরে ডুকরে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে!...এ কি করছেন তিনি! মনে হতেই হঠাৎ থেমে গেলেন। সতর্ক হয়ে গেলেন মিসিজ মুখার্জি। ওই সব খেদোক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে গেলেন না তো তিনি ঘরভরা শ্রোতাদের কাছে। সবাই বোধহয় ওত পেতে রয়েছে কথাগুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যে! স্বামী কি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখে রেখে গিয়েছেন! সুনরা বলে দেয়নি তো দুপুরের ঝগড়াঝাঁটির কথা বাইরের লোকদের কাছে! পুলিসের লোকরা নিশ্চয়ই চাকর-বাকরের কাছে জিজ্ঞাসা করবে!...

"এ তুমি কি করলে গো!"...

আবার আরম্ভ হল কান্না। এবার তিনি খেদোক্তি বদলেছেন। নিজের সম্বন্ধে কোন কথা নাই, খেদোক্তির মধ্যে আর। দুর্নামের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার পথ খুঁজছে দোষী মন। "এ তুমি কি করলে গো!"...

মিসিজ মুখার্জি বেশ বিচলিত হয়েছেন।...হে ভগবান, তিনি যেন কিছু না লিখে গিয়ে থাকেন ঝগড়াটার সম্বন্ধে! এখানকার কারও চোখের দিকে তাকাবার সাহস তাঁর নাই। এরা কতদূর জানে জানা নাই! তাই আরও ঠিক করতে পারছেন না কি করা উচিত, কি বলা উচিত।...সুনরাটাকে একবার বারণ করে দিতে পারলে, হ'ত, যাতে সে কারও কাছে কিছু না বলে, সেই চাবি ছোঁড়বার ঘটনাটার সম্বন্ধে!...কিন্তু সে সুযোগ কি পাওয়া যাবে এত লোকজনের মধ্যে?

"ওগো কেন তুমি এমন ভাবে চলে গেলে গো!"

...আর ডলি তো সব দেখেছে! সে যদি সকলকে বলে দেয়! যদি এরই মধ্যে বলে দিয়ে থাকে। তাকে কিছু বলতে পরিষ্কার বারণ করে দেওয়া দরকার।...

"ওগো তোমার কত আদরের ডলির কথা একবার ভাবলে না...গো।"..."ওরে ডলিরে-এ-এ!..."ওরে ডলিরে-এ-এ!"

প্রতিবেশিনীরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

...ওরে ছাখতো ডলি কোথায়!...ডলি তো নাই; তাকে এক্‌জিকিউটিভ এনজিনিয়রের বউ নিয়ে গেলেন নিজেদের বাড়িতে। ডাকিয়ে পাঠাবো?...না না, ছেলেমানুষ—দরকার কি এসবের মধ্যে তাকে এনে।...অত কথায় দরকার কি, মা ডাকছে; নিয়ে এস সেখান থেকে!...

"এ তুমি কি করলে গো!"..."এ তুমি কি করলে গো!"

কোন রকম ধরাছোঁয়া-না-দেওয়া এই গোছের শোকোক্তি মিসিজ মুখার্জি কান্নার সঙ্গে সঙ্গে করে চলেছেন; কিন্তু মুহূর্তের জন্যও বিরতি পড়েনি তাঁর দোষস্খালনের চেষ্টার। জোরে জোরে কান্না তিনি মাঝে মাঝে বন্ধ করে, স্বামীর দেহের উপর অসাড় হয়ে মুখ গুঁজে থাকছেন কিছুক্ষণের জন্য। এই সময় তিনি কান খাড়া করে রাখছেন, যদি উপস্থিত লোকদের কারও কথা থেকে কোন দরকারী খবর পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে। তারপর আবার আরম্ভ হচ্ছে তাঁর একঘেয়ে সুরে কান্না।

...মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে যাবার সময় তিনি প্রথম জানতে পারলেন স্বামী শেষ চিঠিতে কি লিখে গিয়েছেন।

লোকজনের কথাবার্তা যা কানে এল তা' থেকে বুঝলেন সুনরা বা ডলি দুপুরের ঝগড়ার কথাটা কারও কাছে বলেনি। জেনে তিনি মনে একটু বল পেলেন। তখন থেকে তাঁর শোকোক্তির ধারা আবার বদলায়। নিজের দোষ কাটানর সব চেয়ে ভাল উপায় অপরের উপর দোষ চাপানো, একথা তিনি স্বভাবসুলভ বুদ্ধিতে জানেন।

..."দাও, দাও, কেবল দাও! কত দিতে পারে একটা মানুষে!

ভাইরা তোমায় একদিনও শাস্তি দিল না। তাদের জুলুমে তিক্তবিরক্তি হলে কি, এমনি করেই কি চলে যেতে হয় গো!"

নতুন 'শ্লোগান', নতুন রণকৌশল 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'এর। আগের মত অতটা টেনে টেনে বলা নয়। খুব বেশী জোরেও না। স্বগতোক্তির মত শুনতে।

এই নতুন লাইনেই তিনি চালিয়ে গেলেন পরের দিনও, নিজের বক্তব্য। ভাশুর দেওরদের সঙ্গে বনিবনা তাঁর কোনদিন হয়নি। বড় মেয়ের বিয়ে দিতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কয়েকদিনের বেশী থাকতে পারেন নি। ঝগড়াঝাঁটি করে চলে এসেছিলেন।

পাড়ার লোকেরা তাঁর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা চাইতে এলে, তিনি পরিষ্কার বারণ করে দিলেন, তাঁদের কারও কাছে এখানকার দুর্ঘটনার খবরটা জানাতে।..."কোন খবর দেবার দরকার নাই। আসতে হবে না তাঁদের কাউকে। আপনাদের মত এমন করে, করবে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকে? সেই রকম লোক নাকি তারা? আমি এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকব, চিরকাল! ছেলে-মেয়েদের টেলিগ্রাম করা যখন হয়েছে কাল, তখন আর কাউকে খবর দেবার দরকার নেই।"

তিনি জানেন যে এখানে তিনি কখনই থাকবেন না ভবিষ্যতে। এখানকার লোকজনের কাছে তাঁর লজ্জাটা মাত্র দিনকয়েকের। তাঁর আসল কুণ্ঠা শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছে। তারা ঘৃণাক্ষরে টের পেলে, চিরকাল এ নিয়ে খোঁটা দেবে।...আর কেউ না জানুক, ডলি তো জানে। সে কি বড় হয়ে একথা নিয়ে খোঁটা দিতে ছাড়বে তাঁকে! কে বলতে পারে সে কথা! আর সুনরটা?

দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে, সুনরাকে একান্তে ডেকে বলে দিলেন, সে যেন বাড়ির কোন কথা কাউকে না বলে। এই সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট সুনরার পক্ষে। কোন কথাটা বলতে বারণ করেছেন মেম-সাহেব তা' জানে। ত্রস্ত চাউনি তার। উত্তর দিল অতি সংক্ষেপে। জিভে চিক্ কেটে, উপরে আঙুল দেখিয়ে, সে বলল—"ভগবান আছেন!

ছি ছি ছি!"— অর্থাৎ প্রাণ গেলেও সে একথা বলবে না কাউকে। কথার সুরে মেমসাহেব আশ্বস্ত হলেন; কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলেন না সুনরার ভয়টা কিসের। এত ভয়!

রেলের কন্ট্রাক্‌টার টিউমলও আশ্চর্য হ'ল সুনরার এই ভীত ভাবটা দেখে। সে এসেছিল চুপি চুপি খবর নিতে যে, বাড়ির আসবাব জিনিসপত্র বিক্রি হবে কি না। "মাফ করবেন ভাই সাহেব। আমার কাছে ওসব জিজ্ঞাসা করবেন না।" হাতজোড় করে এই কথা বলেই সুনরা ছুটে পালিয়েছিল সেখান থেকে। এ সব সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সে থাকতে চায় না, কাল রাত্রির সেই ঘটনার পর থেকে।

মুখার্জি সাহেব মারা যাওয়ায় এ চাকরি তার আর থাকবে না এ কথা সে জানে। বাড়ি ছেড়ে দূর দেশে এসেছে, পয়সা রোজগার করতে। কাল রাত্রিতে সেই সুযোগ সে পেয়েছিল। সবাই তখন শ্মশানঘাটে। বাবুর্চি আর মালী 'আউট হাউস'-এ। বাড়িতে সে একা। ঘর-দুয়োর, বাথরুম সে বেশ করে ফেনাইল দিয়ে ধুল। ঘরের কোণায় জলচৌকির উপর সেলাইএর কলটা রাখা আছে। তার নীচেটা ধোয়ার সময় ঝাঁটার সঙ্গে বেরিয়ে আসে চাবির রিংটা।... যে চাবি ছোঁড়াছুঁড়ি নিয়ে আজ এখনকার সংসারটা একেবারে ওলট পালট হয়ে গেল, সেই চাবিটা। বারান্দা থেকে সে সব দেখেছিল। লোহার আলমারির মধ্যে সাহেবের টাকাকড়ি কাগজপত্র থাকে। কত টাকা আছে ওর মধ্যে সেকথা মেমসাহেবও জানেন না। যা আছে তার মধ্যে থেকে কিছু নিয়ে নিলে কেউ বুঝতেও পারবে না। এ রকম সুযোগ জীবনে দুবার আসে না!...

আলমারিটা কিন্তু চেষ্টা করেও খুলতে পারল না। রিংএ একটা মাত্র চাবি। সাহেবকে কত সময় এই চাবি দিয়ে আলমারি খুলতে দেখেছে। বাড়ির অন্য সব চাবি থাকে মেমসাহেবের কাছে—বড় চাবির-গোছায়।...কিন্তু কিছুতেই এ-চাবিটা লাগছেনা যে!...তবে কী...!

হঠাৎ চাবিটা আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগে হাতের মধ্যে।...ভয়ে দম

বন্ধ হয়ে আসে। চাবিটা জলচৌকির নীচে ঠিক সেইখানে রেখে দিয়ে, স্নুনরা গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

এই ভয়ই তার চাউনিতে দেখতে পেয়েছিলেন মিসিজ মুখার্জি, পরের দিন।

ডলিকে কাছে শুইয়ে, পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বারণ করেছিলেন—সে যেন কারও কাছে আগের দিনকার চাবি ছোঁড়বার কথাটা না বলে—দাদা দিদির কাছেও না। মুখচোখ দেখে বোঝা গেল এই দশ বছরের মেয়েটা সব বোঝে, সব জানে। বাবার চিঠিতে কি লেখা আছে সেকথা পর্যন্ত। সব শুনেছে এনজিনিয়র সাহেবের মেয়েদের কাছ থেকে। সে মায়ের দিকে কিনা, তাই কাউকে কিছু বলেনি। একটা গোপন রহস্যের অংশীদার তারা তিনজন—মা, স্নুনরা আর সে। মুখ ফুটে কথাটা তার কাছে বলে, মা তাকে বয়স্থ ব্যক্তির মর্যাদা দিচ্ছেন।…নিজেকে বেশ বড় বড় লাগে।

সারাদিন শুভার্থিনী প্রতিবেশিনীদের আনাগোনার শেষ নাই। দুচার দিনের মধ্যে এখনকার বসবাস তুলে দিতে হবে একথা সবার জানা। তবু সবাই এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন মিষ্টি কথা দিয়ে, যাতে মনে হয় যে ভবিষ্যতে এঁদের এখানে থাকা না থাকা নির্ভর করছে ছেলেমেয়ে জামাইএর উপর। কাল তারা এসে পৌছবে। তারাই এসে ভেবে চিন্তে এ বিষয়ে অন্তিম রায় দেবে।… এমনিও ছেলেমেয়েরা আর ক'দিন পরেই তো আসত পূজোর ছুটিতে —কিন্তু সে আসা, আর এ আসা!…

মুখার্জি সাহেব ঘটনার পূর্বে কি কি খেয়ে ছিলেন, খাওয়ার পর কোন কোন জিনিস পাতে পড়েছিল, আরও কত রকমের প্রশ্ন প্রতিবেশিনীদের। সব প্রশ্নের খুঁটিয়ে উত্তর দিচ্ছেন মিসিজ মুখার্জি। আর উত্তরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে সেই একঘেয়ে অতিকথার ধুয়ো—"…চলে যাবার দিন পর্যন্ত এদের জন্য করে গিয়েছে। না বলেনি কোন দিন।…জমি জিরেত ভোগ করবেন তাঁরা; খাজনাটা এখান

থেকে পাঠাতে হবে।···কাঁঠাল গাছ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করবেন তাঁরা; মামলা মকদ্দমার খরচটা এখান থেকে পাঠাতে হবে।···একেবারে ঢালাও হুকুম এসে গেল। সেখান থেকে ভাই লক্ষ্মণের কাছে— ভাইঝির বিয়েতে খরচ করতে হবে, ঠিক নিজের বড় মেয়ের বিয়েতে যত খরচ হয়েছে তত।···বলো, একটা লোক কি এত পারে?···ছিঁড়ে খেয়েছে! · লোকটি কি অমন করে চলে গেল সাধ করে!"···

প্রথমের দিকে শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধের অভিযোগে খানিকটা অস্পষ্টতা রেখেছিলেন। ডলি আর সুনরার দিকের বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর থেকে অভিযোগগুলো স্পষ্টতর হল। একটার পর আর একটা তথ্য সাজিয়ে নিজের বক্তব্যের বনিয়াদ দৃঢ় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তবু কি উদ্বেগ কম। ছেলেমেয়ে জামাই আসবে কাল সকালে। এলে মনের জোর একটু বাড়ে—ছেলে মেয়েদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে একটু বাঁচবেন। কিন্তু তারা তো সব বুঝতে পারবে; যতই শ্বশুর-বাড়ীর লোককে দায়ী কর, তারা ঠিকই ধরতে পারবে আসল ব্যাপারটা! বিশেষ করে বড় মেয়ে!···

রাত্রিতে শেষ শুভাকাঙ্ক্ষিণীর হাত থেকে রেহাই পাবার পর ডলিকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে শুলেন। দুশ্চিন্তায় ঘুম আর আসে না কিছুতেই।···এতদিন তবু সংসারের ঝড়ঝাপটা আড়াল করে দাঁড়াবার একটা লোক ছিল।···ছেলে এখনও মানুষ হয়নি, এক মেয়ের বিয়ে বাকী,—কত রকমের দুশ্চিন্তা ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে। টাকাকড়ির কথাটাই অবশ্য তার মধ্যে সব চেয়ে বড়।···ঘড়িতে একটা বাজল।··· তেল না মাখলে তাঁর কোন দিন ঘুম হয় না।···তার উপর ঘরের আলোটা জ্বলছে। আলো জ্বালা থাকলেও তাঁর ঘুম আসে না।··· কিন্তু আজ জ্বলুক আলোটা।

ডলি শুয়ে রয়েছে মার পাশে। তারও ঘুম আসছে না; তারও দুশ্চিন্তা কম নয়। অতবড় একটা গোপন খবরের বোঝা বুকের উপর

চাপান থাকলে কি আর ঘুম আসতে চায় কখনও ! তার এতবড় দশ বছর বয়সের মধ্যে সে এমন কাণ্ড কখন দেখেনি।...দিদির চেয়ে অবশ্য কম, কিন্তু বাবা তাকেও ভালবাসতেন খুব। মা যাই বলুন।...বাবা তাকে পুজোর সময় দেবার জন্য যে পার্সেলটা কলকাতা থেকে আনিয়েছিলেন সেটা রেখে গিয়েছেন ওই লোহার আলমারিতে।...মার পরনের থান-কাপড়খানা থেকে একটা গন্ধ বার হচ্ছে। বিচ্ছিরি নতুন কাপড়ের গন্ধটা ;...কম্বল পেতে শুলে বড় গা কুটকুট করে। তাই ঘুম আসে না। মারও ঘুম আসছে না। মা জল খেয়ে এসে আবার শুলেন।...আলো নিভালে বোধ হয়, মার ভয় করছে আজ।...অফিস থেকে আসবার সময় পরশু যখন বাবা পার্সেলটা নিয়ে এসে-ছিলেন, তখন সে ভেবেছিল বুঝি দিদি পাঠিয়েছে সুপুরি কেটে, বিলাসপুর থেকে। তাই আর ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি।...পার্সেলে কি আছে সে কথাটাও যদি লেখা থাকত বাবার চিঠিতে, তাহলে বেশ হত !...এবারে রেল-কলোনির পুজো বোধ হয় তাদের দেখা হবে না। মা আজকে তাকে ঠাকুরগড়া দেখতে যেতে বারণ করেছিল। তাকে কাছে কাছে না রাখলে মা'র সারাদিন ভয় ভয় করছিল।...লোহার আলমারির চাবিটা কোথায় পড়ে আছে কালকে দুপুর থেকে তা সে দেখেছে।...মা বোধ হয় ভুলে গিয়েছে চাবিটার কথা।...আবার উঠল কেন মা ? বাথরুম-এ যাচ্ছে।...হড়হড় হড়হড় করে জল ঢালবার শব্দ আসছে বাথরুম থেকে। এই রাতদুপুরে গা ধুচ্ছে না কি ? ঠিকই তাই। রাত দুপুরে গা ধোয় নাকি লোকে। গরম লাগছিল তো কী হল। সব জিনিসে বাড়াবাড়ি মা'র !...চাবিটা দিয়ে এখন একবার লোহার আলমারীটা খুলে দেখলে হয় না !...এক মিনিটের তো কাজ। শুধু একবার দেখে নেবে সেই পার্সেলটায় কি আছে। দেখে আবার বন্ধ করে রেখে দেবে। মা ফিরে আসবার আগেই আবার চুপিসারে এসে শুয়ে পড়বে।...

ডলি উঠল। চাবিটাকে জলচৌকির নীচ থেকে তুলে নিয়ে সে

আলমারির দিকে এগিয়ে গেল। কান পড়ে রয়েছে বাথরুমের জল-ঢালার শব্দটার দিকে। তাড়াতাড়িতে বুঝি চাবিটা ঢুকছে না। আবার চেষ্টা করল।...না!...আবার ভালভাবে দেখে, হাত যথাসম্ভব স্থির রেখে চেষ্টা করে তবুও খুলল না। নিজের স্যুটকেস সে দিনে কতবার খোলে; আর এই আলমারিটা খুলতে পারছে না! চোখমুখ কুঁচকে, জিভের ডগা বেঁকিয়ে ঠোঁটের কোণায় বার করে দুই হাত দিয়ে প্রাণ-পণে চেষ্টা করেও চাবিটা লাগাতে পারল না।....মা এখনই এসে পড়বে!...যেখান থেকে চাবির রিংটা নিয়েছিল, সেইখানে রেখে পা টিপে টিপে এসে আবার কম্বলের উপর শুয়ে পড়ে। চোখ বুঁজে পড়ে থাকে আড়ষ্ট হয়ে।

মিসিজ মুখার্জি বাথরুম থেকে এসে ডলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডলি জেগে আছিস নাকি?"

ডলি সাড়া দিল না। মেঝের উপর মার মৃদু পা ঘষটানির শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। চোখের পাতা একটু ফাঁক করে সে দেখল। মা জলচৌকির তলা থেকে চাবির রিংটা নিল।...পা টিপে টিপে হাঁটছে কেন মা?...বাবার আলমারিটা বুঝি খুলবে! হ্যাঁ, ঠিকই তাই। খুলবার মত করে চাবিটা ধরেছে দুই আঙুলের মধ্যে।...মা আলমারিটা খুললেই, সে মিছামিছি চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসবে। দেখবে পার্সেলটাতে কি আছে।...অ্যাঁ, এ কি!...

ডলির মা ভেবেছিলেন আলমারি থেকে কিছু টাকা বার করে এনে রেখে দেবেন। স্বামীর উপর রাগ করে কাল যে পুজোর বাজার করে এনেছিলেন তার টাকাও দোকানদারকে দেওয়া হয়নি। প্রতিবেশীরা কালকের শেষকৃত্যাদি থেকে আরম্ভ করে, সব খরচ নিজেরাই পকেট থেকে দিয়েছে। সে সবও শোধ দিতে হবে। কাল মেয়ে জামাইরা এলে সংসারখরচও একটু বাড়বে। যত শোক দুঃখ হক না কেন, খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে তো কেউ থাকতে পারে না। তাই তিনি ভেবেছিলেন কিছু

টাকা আলমারি থেকে বার করে নিয়ে রেখে দেবেন ; তারপর আলমারিটা খোলার বিষয় নিয়ে ছেলেমেয়েদের সম্মুখে একটা নিস্পৃহতার ভাব দেখাবেন। স্বামী থাকতেও তিনি কোন দিনও আলমারি ছুঁতে যান নি—স্বামী চলে যাবার পরও ছেলেমেয়েরাই যেন প্রথম টাকার আলমারিটা খুলল—এমনি একটা ভাব তিনি তাদের সম্মুখে দেখাতে চান।

...ডলিটা জেগে উঠলে তাঁকে ভীষণ অপ্রস্তুত হতে হবে!... বারান্দায় সুনরা শুয়ে আছে—ঘুমিয়ে না জেগে কে জানে। ঘরে আলো জ্বলা রয়েছে—বারান্দার দিক থেকে সব দেখা যায়! তবে আলমারির দিকটা বারান্দার জানালা দিয়ে দেখা যায় না, এই যা!... যত তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে চাচ্ছেন, ততই যেন হাতটা কেঁপে কেঁপে ওঠায় দেরী হয়ে যাচ্ছে।...কী হল আবার!...কিছুতেই যে লাগছে না চাবিটা!...ঠাণ্ডা চাবিটার মধ্যে দিয়ে একটা সিরসিরনির ঢেউ, আঙুলের ডগা বেয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে!...

কী ভাবলেন, কী মনে হল তিনিই জানেন। চীৎকার করে উঠতে গেলেন ; কিন্তু শুকনো খরখরে গলার মধ্যে দিয়ে গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরুল। হাত পা ঠকঠক করে কাঁপছে। পাশের ড্রেসিং টেবিলটা ধরে তিনি কোন রকমে দাঁড়ালেন। চাবিটা ফেলে দিয়েছেন ড্রেসিং টেবিলের উপর। তাকিয়ে দেখবার মত মানসিক অবস্থা থাকলে সম্মুখের আয়নার সাদা-থান-পরা স্ত্রীলোকটিকে চিনতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

ভয় জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে। আলমারিতে চাবি না লাগাবার সঙ্গে ভয়ের সম্বন্ধ থাকতে পারে একথা ডলির মনে হয়নি এর আগে। ধড়মড় করে সে কম্বল থেকে উঠে পড়েছে, কান্নার সুরে চেঁচিয়ে। ছুটে পালিয়ে যেতে চায় ঘর থেকে।

দরজার ছিটকিনি খুলতেই দেখে সুনরা দাঁড়িয়ে। ডলি তাকে জড়িয়ে ধরেছে কাঁদতে কাঁদতে।

সুনরা যখন ঘরে ঢুকল তখনও মিসিজ মুখার্জি সেইরকম করেই দাঁড়িয়ে। ড্রেসিং টেবিলের উপর চাবিটা। দেখামাত্র সে ব্যাপারটা বুঝেছে।

মিসিজ মুখার্জি, ডলি, সুনরা। একটা ভয়ের জালে জড়িয়ে পড়ে তিনটি মন খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে। অব্যক্ত, অজানা ভয়। সে সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বলেনি।

মেঝে থেকে কম্বলখানা তুলে নিয়ে গিয়ে সুনরা পাশের ঘরে পেতে দেবার সময় শুধু বলেছিল—'আমি বারান্দার দোড়গোড়াতেই থাকলাম।'

কম্বলের উপর মাকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে শুয়ে আছে ডলি। বাবার কথা কেবলই মনে আসছে। কাল দাদা, দিদি, জামাইবাবু এরা এলে আর ভয় করবে না।···লোহার জিনিসে আবার ভয় কিসের!···জুতো-জুতো গন্ধ বার হচ্ছে সার সার সাজানো বাবার জুতোগুলো থেকে!··· তাতে ভয় কি!···মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আঙুলের ডগাগুলো মা'র কী ঠাণ্ডা!···

মিসিজ মুখার্জি ভয় পেয়েছেন ডলির চেয়েও বেশী। গা-ছমছমানির ভাবটা বাড়ীময় ছড়ানো—হাল্‌কা কুয়াশার মত। বাদুড়ে উঠনের পেয়ারা গাছে ডানা ঝাড়ছে, দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের পাতায় ফড়ফড় করে শব্দ হচ্ছে, দূর থেকে কুকুর-কান্নার শব্দ আসছে—সব জিনিসের সঙ্গে আতঙ্ক মেশানো। হাওয়ায়-ভেসে-আসা একটা চেনা সিগারেটের গন্ধে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্য। কাকে ভয়, কিসের ভয় সেকথা স্পষ্টভাবে নিজের কাছে স্বীকার করতেও কুণ্ঠা আছে।···যে গুবরে পোকাটা জানলা দিয়ে উড়ে এসে ঠক করে পাপোশের কাছে পড়ল, সেটাকে সুদ্ধ সন্দেহ হয়। অন্য একটা ঘটনার সঙ্গে, এখনকার প্রত্যেক জিনিসের সম্পর্কের কথা আপনা থেকে মনে এসে যায়। ঘড়ি বাজা শুনতে হয়, কতক্ষণে ভোর হবে তারই প্রতীক্ষায়!···শোভন-অশোভনের কথা ভুলে গিয়ে নিজের গরজে সুনরা বারান্দায় গান ধরেছে—এই যা বাঁচোয়া!···

সকালে ছেলেমেয়েরা এসে মাকে দেখে ভয় পেল।···এত মুষড়ে পড়েছে মা!···একদিনের মধ্যে এ কী চেহারা হয়েছে! ডলিটার

সুদ্ধ চোখের কোলে কালি পড়েছে! তাকানো আর যায় না তাদের মুখের দিকে! মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবার সময় বাবার চেয়ে মায়ের কথাই বেশী করে মনে হচ্ছিল মলির।

জামাই-এর কথা কি মিষ্টি!…"মা আপনি যদি এত ভেঙ্গে পড়েন তাহলে আপনার ছেলেমেয়েরা দাঁড়াবে কোথায়?"

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে শাশুড়ী। শোকে হতবাক্ হয়ে গিয়েছেন। চোখের জলও বুঝি তাঁর শুকিয়ে গিয়েছে। আবার পাগল-টাগল না হয়ে যান এই আশঙ্কা জামাইএর।

কান্নাকাটির প্রথম ঢেউটা কাটবার পর, বাড়ির সবাই মিলে দুপুরে বসেছে, এই বিপদের মুখে পরিবারের দায়দায়িত্ব খতিয়ে দেখতে। বাবার স্মৃতিতে জড়ান ঘর-খানাতেই ছেলেমেয়েরা প্রথম থেকেই কম্বল বিছিয়ে নিয়েছিল।…আর ক'দিনই বা এই বাড়িতে থাকতে দেবে!… বিষাদে ভারী হয়ে উঠেছে নূতন করে এই ঘরের হাওয়া-বাতাস, নূতন মানুষদের আসবার সঙ্গে সঙ্গে। মিসিজ মুখার্জিও মনে বল পেয়েছেন, ছেলেমেয়েরা আসায়। তিনি না থাকলে কি কোন কাজের কথা হতে পারে? তাই জামাই তাঁকেও টেনে এনে বসিয়েছে এখানে। তার প্রশ্নে শাশুড়ীকে মুখ খুলতেই হল।

জ্যাঠামশাইকে খবর দেওয়া হয়নি শুনে, জামাই, ছেলে, মেয়ে সকলেই আশ্চর্য হল। ছেলে তখনই ছুটল সাইকেল নিয়ে জ্যাঠামশাইদের টেলিগ্রাম করতে। মিসিজ মুখার্জির একমাত্র ভাই থাকেন বিলাতে; তাঁকে পরে চিঠি দিলেই চলবে। টাকাপয়সার কথাটাও আর স্থগিত রাখা গেল না। বাজারে কত ধার, রেল কোম্পানী থেকে কত পাওয়া যাবে, লাইফ ইনসিওরেন্স আর জমানো টাকার পরিমাণ কত ইত্যাদি সব রকমের কথা এসে গেল। মিসিজ মুখার্জির এক কথা—এসব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—কোনদিন এসব সম্বন্ধে খবর রাখবার দরকারই পড়েনি তাঁর। "আর আলমারিতে?"

মলির প্রশ্ন। মিসিজ মুখার্জি জানেন এর পর কোন প্রশ্নটা আসবে।

উদ্বেগের ছায়া পড়েছে চোখমুখে। ডলির চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি জবাব দিলেন "কে জানে! কে দেখতে গিয়েছে বলো! কোনদিন আলমারি খুলবার অধিকারও ছিল না, স্পৃহাও ছিল না—আজও নেই।"

"চাবিটা কোথায়?"

"ড্রেসিং টেবিলের উপর।"

ডলির চোখের দিকে এখনও তাকিয়ে তিনি।

"টাকার আলমারির চাবি কখন ওরকম খোলা জায়গায় ফেলে রাখে লোকে?"

জামাইএর একথার কোন জবাব দিলেন না মিসিস মুখার্জি। তিনি ডলির চোখের থেকে চোখ সরাননি। ডলির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। মিসিজ মুখার্জির চোখের পাতাও কেঁপে কেঁপে উঠছে।...মলিকে খুব ভালবাসতেন ওর বাবা; ওর হয়ত কোন বাধা আসবে না!...

মলি চাবি নিয়ে আলমারি খুলতে গেল।

ডলির কান্না আসছে। মিসিজ মুখার্জি ডলির মুখের উপর হাত-খানা রাখলেন আদরের ছলে। ঠাণ্ডা হিম হাতখানা।

"একি! চাবি লাগে না কেন?"

হাতের আঙুলের নীচে ডলির ঠোঁটের কাঁপুনি অনুভব করতে পারছেন 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ'। এতক্ষণে তিনি তাকালেন বড়মেয়ের দিকে। হাতের চাবিটাকে উলটে-পালটে দেখছে মলি। দেখতে দেখতে কপালে কয়েকটা কুঞ্চনরেখা পড়ল। ড্রেসিং-টেবিলের উপর থেকে একটা মাথার কাঁটা তুলে নিয়ে সে এসে বসল কম্বলের উপর।...কাঁটা দিয়ে চাবির ফুটোটা খোঁচাচ্ছে।...খুঁচিয়ে বার করে হাতের তেলোর উপর রাখল একটা সুপুরির টুকরো—খুব মিহি করে কাটা। মলির চোখে জল এসে গেল সুপুরির টুকরোটা দেখে।

ল-অ-হ-অ-র...

লোহার জিনিস সম্বন্ধে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল ডলি—মা তার মুখখানা কোলের মধ্যে গুঁজে ধরেছেন।

…"ভাইদের উপর রাগ করে, এমনি করে চলে গেলে গো!"… "অবিবেচক ভাইরা তোমায় এমনি করে মেরে ফেলল গো!"…"মায়ের পেটের ভাইরা তোমায় শেষ না করে ছাড়ল না গো!"…জোরে আরও জোরে।

বাহাত্তুর

মানহানির মোকদ্দমাটা নিয়ে বেশ খানিকটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে শ্রীদাম সাহার। এই উত্তেজনাটাই তাঁর নেশা। মহাজনী কারবার করেন। কোর্টে মোকদ্দমা লেগেই থাকে। প্রত্যহ নিজে না গেলেও চলে; কিন্তু তিনি না গিয়ে থাকতে পারেন না। এই বাহাত্তর বছর বয়সেও নথিপত্রের পুঁটুলিটা বগলে নিয়ে কি রোদ, কি বৃষ্টি ঠুকুর ঠুকুর করে হাঁটতে হাঁটতে কোর্টে তাঁর যাওয়া চাই-ই চাই। কাছারার বারান্দায় ছাতা মাথায় দেওয়া অবস্থায় কত সময় তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়; কত সময় দেখা যায় নথিপত্রের পুঁটুলি-টাকে বালিশ করে বার-লাইব্রেরীর বেঞ্চিতে ঘুমচ্ছেন। সকলেই তাঁকে চেনে। জাল জুয়াচুরি না করে, আইনসঙ্গত উপায়ে তিনি প্রচুর বিষয়সম্পত্তি করেছেন; কিন্তু শহরের লোকে সকালবেলাটায় তাঁর মুখ দর্শন বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করে না। স্কুলের ছাত্রদের ধারণা, শ্রীদামবাবুর মুখ দর্শনের অমঙ্গল এক শুধু কাটতে পারে তাঁর দাঁত দেখলে।

বার-লাইব্রেরীতে একদিন ব্যারিস্টার সাহেব তাঁকে হাসতে হাসতে বিশ্রীদামবাবু বলে সম্বোধন করেছিলেন। অন্য লোক হলে চেপে যেত; কিন্তু তিনি মানহানির মোকদ্দমা এনেছিলেন কোর্টে। তাঁর বাঁধা উকিল আছেন আদালতে। দু টাকা করে ফি এবং মক্কেলের বলা পয়েন্ট অনুযায়ী বহস্, এই কঠিন শর্তে রাজী বলেই তিনি শ্রীদামবাবুর আস্থাভাজন হতে পেরেছেন। বিবাদী পক্ষ থেকে বলা হয় যে, শহরের বাসিন্দারা সকলেই বাদীর নাম নেবার দরকার পড়লে বিশ্রীদামবাবুই বলে। শ্রীদামবাবুর উকিল বহস্ করেন যে, সকালে অভুক্ত অবস্থায় ছাড়া আর কখন কেউ তাঁর মক্কেলকে

বিশ্রীদামবাবু বলে সম্বোধন করে না ; এবং মানহানির কথাটা বলা হয় ব্যারিস্টারসাহেবের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর।

ওইরকম একটা মোক্ষম পয়েণ্ট মাথায় খেলেছিল বলে বেশ খুশী মেজাজে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন শ্রীদামবাবু। এক শুধু দুর্ভাবনা যদি অপরপক্ষ হাকিমকে ঘুষ খাওয়ায়।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মিতব্যয়ী বলে বাইরে তাঁর দুর্নাম আছে ; কিন্তু তাঁর বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার দিকটা ভাল। ভাল-মন্দ খাওয়ার দিকে তাঁর ঝোঁক আছে ; এবং এই ঝোঁকটা বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে দিনদিনই বাড়ছে। ভেবেছিলেন যে, আজ জমিয়ে মোকদ্দমার গল্পটা করবেন স্ত্রীর কাছে, কিন্তু জলখাবার খাওয়ার সময় শুনলেন যে, তাঁর হাঁপানির টানটা হঠাৎ বেড়েছে। সৃষ্টিধরের মা বারোমাস এই হাঁপানি রোগে ভোগেন। পঞ্চান্ন বছর আগের সেই বিয়ের দিন থেকেই তিনি দেখেছেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে ; আঙুলে তুলে নিয়ে একটু পায়েস ছোট নাতনীর মুখে দিয়েছেন ; এমন সময় একটা মারাত্মক খবর শুনলেন বড়বউমার মুখে। আজকাল বাড়ির লোকে তাঁর সঙ্গে একটু সাবধান হয়ে কথা বলে ; কোন কথার যে কি মানে করে নেবেন এই ভেবেই সবাই তটস্থ। কাজেই খবরটার মারাত্মকতার দিকটার কিছুমাত্র আঁচ পেলে বড়বউমা কথাটা তুলতেন না শ্বশুরের কাছে। শাশুড়ির অসুখের আধুনিকতম চিকিৎসার সম্বন্ধে খবর। মজার কথা ভেবেই বলা ; কিন্তু ছেঁকা লাগবার মত গিয়ে লাগল কথাটা শ্রীদামবাবুর মনে। মনের অস্বাচ্ছন্দ্য চাপা দিয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"নরেন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল কেন ?"

জবাব দিলেন মেজবউমা। "নরেনবাবু নিজে থেকেই এসেছিলেন বন্ধুর খোঁজে ; কি যেন দরকার ছিল। কথাবার্তা হওয়ার পর বুঝি নিজে থেকেই বট্‌ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছেন মা কোথায়। মার তো তখন নীচে নেমে দেখা করবার মত অবস্থা নাই। তিনি নিজেই উপরে গিয়ে দেখলেন মাকে।"

যতদূর সম্ভব গলার স্বর নরম করে শ্বশুর বড়বউমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভিজিটের টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো?"

সকলেই জানেন যে, নরেন ডাক্তার সৃষ্টিধরের বন্ধু; এবাড়ি থেকে ফি নিতে পারেন না। তবু বড়বউমাকে উত্তর দিতে হয়—"আমরা কি করে বলব?"

"দেখ বড়বউমা, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে করবার অভ্যাস ছাড়! বলো জানি না—আমি জানি না। আমরা টামরা নয়! পরিষ্কার কথার পরিষ্কার উত্তর দেবে!"

"আমি জানি না।"

"সৃষ্টিধরের কি এসব খেয়াল আছে! কাল আমাকেই পাঠাতে হবে টাকাটা। কারও ন্যায্য পাওনা, যে কোন ছুতোয় তাকে না দেওয়া ঠকামি। চারশ বিশ দফার নাম শুনেছ তো? তাই। আমি যা চাই তা কি এরা হতে দেবে!"

হন হন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এখন দেখ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! শ্বশুরের মেজাজ বউরা বোঝে; কিন্তু এই অকস্মাৎ উষ্মার কারণ তারা ঠিক ধরতে পারল না। হিসাবী তিনি ঠিকই। কম্পাউণ্ডারবাবুই এ বাড়ির ডাক্তার, কারণ তিনি ইনজেকশন দিতে এক টাকা করে নেন। শ্রীদামবাবু আরও বলেন যে, আজকালকার ডাক্তাররা যখন শুধু পেটেন্ট ওষুধই খেতে দেয় রুগীকে, তখন কম্পাউণ্ডার আর ডাক্তারে তফাত কি? তবে শক্ত অসুখে টাকা খরচের ভয়ে বড় ডাক্তারকে ডাকবেন না এমন লোক তিনি ন'ন। একথা বাড়ির বউরাও জানে। বিশেষত স্ত্রীর বেলায় তাঁর রাশ যে একটু আলগা, একথা শুধু বাড়ির কেন, বাইরের লোকেও জানে। তবে তিনি এমন চটলেন কেন? বুঝতে না পেরে পুত্রবধূরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল কথাটা। নরেন ডাক্তারকে ফি না দেওয়ার কথাটা যে তাঁর রাগের আসল কারণ নয়, একথা তারা বুঝতে পেরেছে।

শ্রীদামবাবু খবরটা শুনেই বেশ বিচলিত হয়েছেন। বুঝতে পারছেন যে, আর কেউ ব্যাপারটাকে সে গুরুত্ব দিচ্ছে না।···দেবে না কেন? উচিত ছিল দেওয়া। তিনি বাড়ির কর্তা। একবার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করল না! এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে! কিন্তু শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পাত্র তিনি ন'ন। সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য তিনি স্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। সৃষ্টিধরের মা খাটের উপর বসে। কোলে দুটো বালিশ নিয়ে তিনি হাঁপাচ্ছেন আর কাশছেন তখনও। পাকা চুলের মধ্যের টাকপড়া সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর নজরে না পড়ে পারে না। প্রথম কথাতেই ধরা পড়ে গেল স্ত্রীর মনোভাব। সৃষ্টিধরের মা মানহানির মোকদ্দমার সম্বন্ধে প্রত্যাশিত প্রশ্নটা করলেন না; পায়েসে মিষ্টি বেশী হয়েছিল কিনা কিংবা বউমারা খাওয়ার সময় পাখা নিয়ে কাছে বসেছিল কিনা, একথাও জিজ্ঞাসা করলেন না; মুখে একগাল হাসি নিয়ে তিনি তুললেন নরেন ডাক্তারের নূতন প্রেস্‌ক্রুপ্‌-শনটার কথা। হাঁপানির টান সত্ত্বেও যেরকম উৎসাহের সঙ্গে বলা, তাতে মনে হল যে, ডাক্তারের ব্যবস্থা পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে তাঁর মনের কাছ থেকে।···নরেন ডাক্তার এসেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কোন্ জিনিস খেলে হাঁপানিটা আরম্ভ হয়। ধোঁয়া নাকে গেলে বাড়ে নাকি, স্নান করলে বাড়ে নাকি, ছেলেবেলায় কবে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল মনে আছে নাকি—আরও কত এইরকমের হাবিজাবি প্রশ্ন। সব শুনে বললে—এক কাজ করে দেখুন। উপকার যে হবেই তা' সে ঠিক বলতে পারে না; তবে চেষ্টা করে দেখা উচিত। এ ঠিক হাঁপানি নয়; রোগের নাম ব্যানার্জি না কি যেন বললে।···কত রকমের যে নতুন নতুন রোগ হচ্ছে আজকাল!···

হতবাক হয়ে গিয়েছেন শ্রীদামবাবু স্ত্রীর কথার ধরন দেখে। পুত্রবধূরা যা বলেছিলেন সংক্ষেপে, ইনি সেই কথাই বলছেন বিস্তৃত ভাবে। মা আর ছেলের মধ্যে পরামর্শ হয়েছে! তাঁকে ধর্তব্যের

মধ্যে গোনেনি। এমন মারাত্মক বিষয়টা বিচারের সময়ও! হ্যাঁ মারাত্মক বইকি।...তাঁকে খবর দিতে যাবে কেন। মনেই পড়েনি তাঁর কথা!

স্ত্রীর কথা কানে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অনর্গল বলে চলেছেন নূতন ওষুধটার কথা।...কতই বা দাম। সস্তার ওষুধ। সারলে পরে অবাক হবার কথা। কিন্তু ও কি আর সারবে! অত সোজা নয় এ রোগ। কত কিছুই তো করে দেখলাম সারাজীবন ধরে। আরশোলা-সেদ্ধ জল খেয়েছি তোমার কথায়। সেবার ওষুধের সিগারেট পর্যন্ত খেতে হয়েছে তোমার পাল্লায় পড়ে।...

শুনছেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। তিনি জানেন যে, স্ত্রীর কথাগুলো আন্তরিক নয়; স্ত্রীর মনে মনে বিশ্বাস ওষুধে আশু ফল পাবেন। নূতন ওষুধের সন্ধান পেয়ে বেশ উৎফুল্লই হয়েছেন তিনি।...ওষুধের সস্তা দামটাই শুধু দেখলে সৃষ্টিধরের মা! ওর দাম কি শুধু ওই কয় আনাই? আমার দিকটা না হয় না ভাবলে, নিজের দিক থেকেও তো ভাবো জিনিসটাকে। তোমার মাছ খাওয়া ঘুচবে, সাদা থান পরতে হবে, আরও কত কি করতে হবে! ছেলে, ছেলের বউ আজ তোমায় মাথায় করে রেখেছে—তখন কি কেউ পুছবে। ওদের সংসারে একবেলা চাড্ডি আলোচালের ভাত খেয়ে শুধু বেঁচে থাকতে পাবে।...যাক, সেসব যার জিনিস সে বুঝবে।...

মুখে বললেন—"দেখ, কতদূর কি হয়।"

প্রায় অর্থহীন কথাটা। তারপর শ্রীদামবাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। মৃত্যুভয়টা তাঁর চিরকালের; ইদানীং বেড়েছে। এ নিয়ে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও বাড়ছে দিন দিন। অনেক বিষয়ে মন খুঁত খুঁত করে। সন্দেহ হয়। পারলে পরে সাবধান হয়ে যান। ছেলেমেয়েরা না জানুক, স্ত্রী তাঁর স্বভাবের এই দিকটার কথা জানেন। সময় সময় স্ত্রীর কাছে বলেও ফেলেন কিনা। এখনও বলতে পারলে হয়ত আসন্ন সঙ্কটের একটা সমাধান হতে পারত।

যাঁরা আঘাতটা দিয়েছেন তাঁরা সামলে যেতেন নিশ্চয়ই। অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আসা আঘাতের প্রকৃতিটা আবার অপরের কাছে বলবার মত নয়। এত ব্যক্তিগত, এমন একটা স্পর্শকাতর জায়গার সঙ্গে সম্বন্ধিত যে বলতে বাধে। সে-ই হয়েছে মুশকিল। অভিমানের শ্রেণীর মনের ভাবের কোনই মূল্য থাকে না, যদি 'ওগো আমি অভিমান করেছিগো' বলে সেটা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়।... তাঁর দিকটা একবার মনেও পড়ল না সৃষ্টিধরের মায়ের!...অমন ওষুধ ব্যবহারের কথা উঠতেই যে মনে পড়া উচিত ছিল। এ দুঃখ তাঁর রাখবার জায়গা নাই।

যে কথাটা ভাবতে চান না, সেই কথাটাই বারবার মনে আসে। যত দুশ্চিন্তাটা মন থেকে দূর করে ফেলতে চান, ততই যেন উদ্বেগ বাড়ে। বয়স হয়ে এই হয়েছে মনের অবস্থা! বোঝেন, কিন্তু আবার না করেও পারেন না। একটা উদ্বেগ যায় তো আর একটা এসে তার জায়গা নেয়। কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা ছিল, যে অপর পক্ষ আবার হাকিমকে ঘুষ খাইয়ে মানহানির মোকদ্দমার রায় পাল্‌টে না দেয়। সেই দুশ্চিন্তার জায়গা নিয়েছে এখন স্ত্রীপুত্রের সৃষ্টি করা অমঙ্গলের অবশ্যম্ভাবিতা। ছেলেরা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করে তাঁকে; কিন্তু এর সবগুলোই কি অকারণ উৎকণ্ঠা? রক্তের গরমে ওরা অনেক জিনিস উড়িয়ে দেয় তুড়ি মেরে। কিন্তু বাহাত্তর বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা তো তাদের নেই। সে কথাটাও ওরা স্বীকার করবে কিনা কে জানে। আরে তোরা বুঝবি কি; এই সব ছোট ছোট জিনিসগুলোর উপর নজর চিরকাল ছিল বলেই তোদের জন্য এত সব টাকাকড়ি সম্পত্তি রেখে যেতে পারব। তোদেরই জন্য এত সব; আর একবার মনেও পড়ল না আমার কথাটা!...

বড় ছেলে বাড়ীতে বলে গিয়েছে যে সে রাত ন'টায় ফিরবে ওষুধ নিয়ে। নরেন ডাক্তারের সঙ্গে কোথায় যেন একটা কাজে

গিয়েছে। কাজ মানে ইনসিওরের দালালি। সৃষ্টিধর একবার তাঁকেও ঘুরিয়ে বলেছিল লাইফ ইনসিওর করতে। বেশী বয়সেও নাকি লাইফ ইনসিওর করা যায়। তিনি কানে তোলেন নি কথাটা। তাঁর ধারণা ইনসিওর করা লোক বেশী দিন বাঁচে না। সৃষ্টিধরের মা কিন্তু তখন তাঁকে লাইফ ইনসিওর করতে বারণ করেছিলেন। সেই মানুষের আজ স্বামীর অস্তিত্বের কথাটা মনেই পড়ল না!···এই সেদিনও' সৃষ্টিধরের মা সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেছেন; এক গুরুর কাছ থেকে দুইজনে একসঙ্গে দীক্ষা নিয়েছেন; একসঙ্গে তীর্থভ্রমণ করে এসেছেন কিছুদিন আগেও; প্রয়াগসঙ্গমে স্নান করবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের কথায় দুজনের আঁচল একসঙ্গে বেঁধে তাঁরা একসময়ে ডুব দিয়েছিলেন। এ সবই কি লোক দেখান?

শ্রীদামবাবু ঘড়ি দেখলেন। নটা বাজবার এখনও অনেক দেরী আছে।

···বাড়ির কর্তার দিকটাই তো সবচেয়ে আগে মনে পড়া উচিত বাড়ির লোকের। এ বাড়ির লোকের ওঠা-বসা, কাজ বিশ্রাম সব নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর সুবিধা-অসুবিধার উপর লক্ষ্য রেখে। তিনি যেমন ইচ্ছা চলেছেন; অন্য সকলে অতি সন্তর্পণে তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে কোর্টে যাবার জন্য যত সকাল সকালই খান না কেন তিনি তাঁর প্রিয় পলতার বড়া এবং ছানার ডালনা একদিনও পাননি একথা মনে পড়ে না। তাঁকে ঘিরেই এ সংসারের সব কিছু। তিনি শুলে পাশের ঘরের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে। ছেলেরা বড় হয়ে আজকাল তবু তাঁর সঙ্গে একটু আধটু কথাবার্তা বলে; আগে তো সে সাহসও ছিল না। তাঁর ছোট ছেলেটা যখন পাঁচ ছয় বছরের তখন তিনি বাড়ি ঢুকলেই সে ভয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকত। ঘরের দেওয়ালে সম্মুখে টাঙান রয়েছে ছোট ছেলের বিয়ের সময়ের তোলা একখানা গ্রুপ ফটো। মাঝখানে বসে রয়েছেন তিনি। ছেলে, মেয়ে, বউ, নাতি, নাতনী—

চার সারিতে অতি কষ্টে এঁটেছে ফটোর কাগজে। তাঁকে কেন্দ্র করেই সব…'এক ছেলে ছেলে নয়, এক টাকা টাকা নয়।' তাই তাঁর অনেক সন্তান, অনেক টাকা! এতগুলো প্রাণীর কাছ থেকে তাঁর অবাধ ক্ষমতার স্বীকৃতি পাওয়া, বাড়ির কর্তার এইটুকুই তো তৃপ্তি। তাঁর ধারণা ছিল এরা তাঁকে ভালওবাসে। সবই কি ভুল? সবই কি ফাঁকি?…তাঁর দিকটা একবার ভাবলও না এরা!

এরা মানে সৃষ্টিধরের মা।

…নিজের স্বার্থ নিয়েই উন্মত্ত! এগারটি সন্তানের জননী। সংসারের লক্ষ্মী বলেই তাঁকে জানতেম। সেকেলে মানুষ শ্রীদামবাবু। ভাবতেন স্ত্রী ভাগ্যেই তাঁর এত ধন জন বিষয় সম্পত্তি। এই পঞ্চান্ন বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছেন, সবটুকুকে মিথ্যা ছলাকলা বলে ভাবতে বাধে। সেইজন্যই স্ত্রীর তাঁর কথা মনে না পড়াটা তাঁকে ব্যথা দিচ্ছে আরও বেশী করে। ব্যারিস্টার সাহেবকে 'আর্গুমেন্ট' দিয়ে কাবু করবার উল্লাসে বিকালের আহারটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছে। অম্বলে বুক জ্বালা করছে। দুশ্চিন্তা বাড়লে তাঁর অম্বলও বাড়ে। একটু জল খেলে হয়। কিন্তু তিনি চান না এ বাড়ির কাউকে ডেকে এখন জল আনতে বলতে। কোন নাতনী হয়ত জল নিয়ে আসবে; এসে দাদুর সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে বকবে কতক্ষণ কে জানে। সে সময়, আর সে মনের অবস্থা এখন তাঁর নাই।…ন'টা এখনও বাজেনি। এখনও সময় আছে— স্ত্রীর মনে পড়বার সময়, আর নিজের ভেবে দেখবার সময়।…স্ত্রীকে মুখ ফুটে বলে মনে করিয়ে দিতে হবে স্বামীর অস্তিত্বের কথাটা? কেশে আমি বেঁচে আছি এই কথাটা জানিয়ে দেওয়ার মতই হাস্যাস্পদ! অমঙ্গলে বলে ছোট করায়, যে লোকটা ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে মোকদ্দমা লড়তে পারে, নিজের অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে স্ত্রীর কাছে ছোট হতে পারে না। মরে গেলেও না! সৃষ্টিধরের মা'র চোখে তিনি খেলো হতে চান না।…আচ্ছা হাসিঠাট্টার ছলে কথাটা সৃষ্টিধরের

মাকে বলে দিলে কেমন হয়? একটু ঘুরিয়ে বলা। 'ওগো—মাছে আঁষাটে গন্ধ লাগতে আরম্ভ করেছে বুঝি আজকাল'—বা ওই গোছের কোন কথা? ওতেও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।...স্ত্রীর অধিকার আছে নিজের অসুখ সারাবার চেষ্টা করবার; ছেলের অধিকার আছে নিজের মায়ের জন্য ওষুধ কিনে আনবার; তাদের অধিকার আছে তাঁর অস্তিত্ব ভুলে যাবার; তিনি তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চান না কোন কথা বলে। আদালতের কড়া জজ সাহেবের মত পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে তিনি আচরণের ন্যায় অন্যায় বিচার করতে চান। হয়ত হয়ে ওঠে না সব সময়, কিন্তু সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনেও আইনসঙ্গত অধিকার ও দায়িত্বের পরিমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপে মেপে চলতে চান।

...সিঁথিতে সিঁদূর নিয়ে স্বর্গে যাওয়াই তো চিরকাল মেয়েদের কাম্য বলে জানতেন। সৃষ্টিধরের মারও আজকালকার মেয়েদের মেমসাহেবী হাওয়া লাগল নাকি? আইন তো হয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদ করে নিলেই তো পারে যদি তার মন চায়!...মানহানির মোকদ্দমায় বড়লোকের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে বড় ভাবছিলেন তিনি খানিক আগে। কতটুকু মূল্য তার! থেঁতলে চটকে পা মাড়িয়ে চলে যাওয়ার চাইতেও অপমানজনক হচ্ছে চোখের সম্মুখে থেকেও নজরে না পড়া! নিজের কাছে নিজের লজ্জা করে!...কে জানে, হয়ত তাঁর কপালে লেখা আছে যে, তাঁর স্ত্রীই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবেন। সে কথা ভাবলেও ভয়ে গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে! কপালের লেখা জিনিসটা কি ধরনের তা ঠিক জানা নাই। আইনের ধারাগুলো যেমনভাবে লেখা হয়, সেই রকমই নাকি? আইনের ধারার মত কপালের-লেখার মধ্যেও ফাঁক ও ফাঁকি খোঁজা চলে নাকি? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করলেও কি কপালের-লেখাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না? যাকগে! লোকে শুনলে পাগল ভাববে। এই সব মনের কথা যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায় তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না। এসব চিন্তার কি কোন মাথামুণ্ডু আছে!...

তবে একথা তিনি বলবেন যে, কপালের-লেখা খণ্ডানো শক্ত বলে কি তাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনতে হবে ?···মেটে-সিঁদূর আবার একটা ওষুধ নাকি ! যত ভাবেন, তত মাথা গরম হয়ে ওঠে।···রগের কাছটায় দব্ দব্ করছে। অম্বল হলেই তাঁর এই রকম মাথা দব্ দব্ করে আর বুকের কাছে ব্যথা ব্যথা করে। দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। ছেলের ফেরবার সময় হল। এখনও ভেবে কিছু কুল-কিনারা পাননি। বড় গরম লাগছে। ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। জিভ গলা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা আনচান ভাব হচ্ছে। ওই ! নীচে মোটরগাড়ির শব্দ ! শ্রীদামবাবু উঠে একবার বাথরুমের দিকে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সৃষ্টিধরই প্রথম জানতে পারল। তারপরে তো হইহই পড়ে গেল বাড়িতে। কান্নাকাটি, ডাক্তার, বদ্যি, নার্স, অক্সিজেন আরও কত কি ! বড় ভয়ানক রোগ। চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ভাগ্য ভাল যে, ডাক্তার ডাকবার সময় পাওয়া গেল। সেই যে মেঝের উপর এনে শোয়ানো হয়েছিল, তিন দিন সেই একই অবস্থায়। নরেন ডাক্তার বলেছিল নড়াচড়া বারণ।

তারপর আস্তে আস্তে কথা বলবার ক্ষমতা এল, ভাববার শক্তি এল, মনে বল এল। এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে বাড়ির লোকে। সৃষ্টিধরের মা মানতের পুজো দিলেন বুড়োশিবতলায়। ওই বেঁচেই গেলেন; নরেন ডাক্তার বলেছে, এখনও তিন মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে; তারপর যতদিন বাঁচবেন, বেশ সাবধানে থাকতে হবে; তেল ঘি খাওয়া বারণ— যতকাল বাঁচবেন মাখনতোলা দুধ খেতে হবে। কোর্টে যাওয়া আর চলবে না।

ভাববার ক্ষমতা ফিরে পাবার দিন থেকেই শ্রীদামবাবু কত কি ভাবছেন। এ যাত্রা নিস্তার পেলেন ভেবে আনন্দ আছে; কিন্তু এর চেয়ে বেশী তৃপ্তি যে তাঁর সন্দেহ অমূলক ছিল না। ধরেছিলেন ঠিকই।

এসব জিনিসকে বাহাত্তুরে বুড়োর খামখেয়ালী বলে উড়িয়ে দিলেই তো হল না! জন্তুজানোয়াররা পর্যন্ত বিপদের গন্ধ টের পায়। চিরাচরিত আচার ব্যবহারগুলো আইনের ধারার মত জিনিস। মেনে চলতে হবে। সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে তার মানে করতে হবে। লোকাচার যেখানে বলছে—এই করতে হবে, সেখানে তা না করলে কি হবে, সে কথাটা বোঝবার জন্য বি এ, এম এ, পাশ করার দরকার নাই। ওসব আচারের পান থেকে চুন খসলে কি হয়, সেটা খেয়াল হওয়া উচিত ছিল একজন সাতষট্টি বছর বয়সের সধবা স্ত্রীলোকের!… হয়ত খেয়াল হয়েছিল ঠিকই। জেনেশুনে যদি স্বষ্টিধরের মা এই কাজ করে থাকেন, তাহলে সে কথার কোন জবাব নেই। মা ছেলেতে মিলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে যদি এই কাজ করে থাকে তাহলে তাদের কিছু বলবার নাই…স্বষ্টিধরের মায়ের এই কাণ্ড! বহু নিমকহারাম তিনি সারাজীবন ধরে দেখছেন। বিপদের সময় এসে টাকা ধার নেয়; তারপর তামাতুলসী হাতে নিয়ে হাকিমের সম্মুখে গিয়ে বলে যে, তারা টাকা ধার নেয় নি। এই তো লোকের ধারা! কিন্তু তাঁর স্ত্রীপুত্রের মত অকৃতজ্ঞ লোকের কথা তিনি এর আগে কল্পনা করতে পারেন নি। বিশ্বাস তিনি কোন দিনই কাউকে করেন না। টিপ সই না নিয়ে তাঁর অতি বড় বন্ধুকেও টাকা ধার দেননি। তবু এতটা আশা করেননি নিজের স্ত্রী পুত্রের কাছ থেকে। যাদের তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন তাদের কাছ থেকে।

মেয়েমানুষেরা সব বুজরুক! সুবিধা পেলেই নিজমূর্তি প্রকাশ করে। ভেবে ভেবে তিনি দেখেছেন স্ত্রীর স্বভাবের পরিবর্ত্তনের দিকটা। অল্প বয়সে স্বামীর ভয়ে জুজু হয়ে থাকত। সেকালকার কথা সব মনে আছে। বড় করে কথা বলবার সাহস ছিল না স্বামীর সম্মুখে। ছেলেরা বড় হবার পর থেকেই তিনি প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন স্বষ্টিধরের মায়ের। বাপ যতই করুক ছেলেদের জন্য, তারা সব সময় মায়ের দিকে। মায়েরা সেটা বেশ বোঝে। তাই যত ছেলেরা বড়

হয়, তত তাদের বুকের পাটা বাড়ে। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে 'ডোণ্টকেয়ার'। ছেলেরা বড় হবার পর থেকে সত্যিই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটু ভেবে চিন্তে কথা বলেন।…কিন্তু এতটা! ঘেন্না ধরে গিয়েছে তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলের উপর। সবাই মিলে পরামর্শ করে এই কাণ্ড করেছে। ওই নরেন ডাক্তারটাও এর মধ্যে আছে। ডাক্তার না ছাই! ইনসিওরের ডাক্তার আবার ডাক্তার নাকি! তার আবার ওষুধ, তার আবার চিকিৎসা! মা-ছেলেতে পরামর্শ করে তাঁর কাঁধেও চাপিয়েছে নরেন ডাক্তারকে। কথা বলাও নাকি তাঁর পক্ষে খারাপ। তাই একটা কলিংবেল রাখা হয়েছিল তার কথামত তাঁর বালিশের কাছে। কোন দরকার পড়লে ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাকতে হবে? কেন বাড়ীর লোকজন কেউ না কেউ চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতে পারে না রোগীর পাশে? আর যেখানে বাড়ীর কর্তা নিজে রুগী! টান মেরে ছুঁড়ে তিনি ফেলে দিয়েছেন কলিংবেলটাকে সেই দিনই! ভাবে কি বাড়ীর লোকে তাকে! যতটা বেকুফ ভাবে, ততটা বেকুফ তিনি নন! সৃষ্টিধরের মা ছুটে এসেছিলেন কলিংবেল মেঝেতে পড়বার শব্দটা শুনে।

"কিছু বলছ? কিছু এনে দেব?"

স্ত্রী আসতেই কেমন যেন শক্ত আড়ষ্ট গোছের হয়ে গিয়েছিল শ্রীদামবাবুর সর্বশরীর। কোন উত্তর দেননি তিনি। অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন। স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে, বালিশের পাশে এসে বসেছিলেন; তিনি জানেন রোগভোগ হলে ছেলেমানুষী রাগ বাড়ে সব মানুষেরই। সেইদিন থেকেই শ্রীদামবাবু লক্ষ্য করলেন যে সৃষ্টিধরের মা কাছে এসে বসলেই তাঁর শরীরে আড়ষ্টতা আসে। আগেকার সেই সহজ ভাবটা আর কিছুতেই আনতে পারেন না। তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কাটা যে অমূলক ছিল না, সে কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে হাতে নাতে; মৃত্যুর পূর্বস্বাদ তিনি পেয়ে গিয়েছেন; ঠিক যখন সৃষ্টিধরের মা সিঁথির সিঁদূর মুছে ছেলের আনা মেটে সিঁদূর সিঁথিতে

দিয়েছেন, তখনই "করোনারী" রোগটা তাঁকে চেপে ধরে ; এ সম্বন্ধে তাঁর আর কোন সন্দেহ নাই। যতই চেষ্টা করুন সেই স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ব্যবহারে খানিকটা আড়ষ্টতা আসতে বাধ্য। আর এ রকম স্ত্রীপুত্রকে খাতির করে চলবার কোন কারণও থাকতে পারে না। তাঁর অসুখ, ও সৃষ্টিধরের মায়ের আসল-সিঁদুর মোছার মধ্যে সম্পর্কটা সবচেয়ে নির্বুদ্ধি লোকেরও নজরে পড়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি জেগে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে আর ডেকে তুলবে কি করে! ওরা সব জানে! সব বোঝে! বুঝে না বোঝবার ভান দেখায়! রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে তাঁর।

শ্রীদামবাবু সব সময় চেষ্টা করেন যাতে তাঁর মনের রাগ কথাবার্তায় প্রকাশ না পায়। ফলে অধিকাংশ সময়েই তিনি চুপ করে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকেন। স্ত্রীপুত্ররা তাঁর এই গাম্ভীর্যকে শারীরিক দুর্বলতা ও বর্তমান রোগের একটা লক্ষণ বলে ভাবে। রুগীর মন ভাল রাখবার জন্য তাঁরা সব সময় অনর্গল গল্প করে যান। নরেন ডাক্তারের সঙ্গে যাতে তিনি কোন রকম অসদ্ব্যবহার না করেন, সেই ভেবে সৃষ্টিধর আর সৃষ্টিধরের মা অনেক সময়ই 'অ্যালার্জি' রোগের গল্প এবং নরেন ডাক্তারের অদ্ভুত চিকিৎসার কথা তোলেন।... বিচিত্র মতিগতি এ রোগের। ওষুধও না বিষুধও না! লাল সিঁদুর মুছে মেটে সিঁদুর দিলাম সিঁথিতে—আর তাতেই সেরে গেল এতকালকার রোগ। এখন মনে হয় কেন পুষে রেখেছিলাম এ রোগ? এত সোজা যার চিকিৎসা!...শোনেন, আর মাথা থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত রিরি করে ওঠে। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা যায় কিন্তু কানতো বন্ধ করে রাখা যায় না ইচ্ছা করলেও। শুনতেই হয় বাধ্য হয়ে।...কেবল নিজের রোগের কথা! কই, স্বামীর যে ভয়ানক রোগটাকে নিয়ে যমে মানুষে লড়াই চলল এ কয়দিন, সে কথাতো ভুলেও বলে না!...

মন খারাপ হতে পারে ভেবে স্ত্রীপুত্ররা তাঁর রোগের কথাটা তোলে না, একথা তাঁর খেয়াল হয় না। কেবলই মনে হয় যে স্ত্রীপুত্র

যখন শুধু নিজের দিকটা দেখতে পেরেছে, তখন তাঁরও নিজের দিকটা দেখতে পারবার অধিকার আছে। পালটা জবাব তিনিই বা দেবেন না কেন! যেতে দাও না আর কয়েকটা দিন।......মনে মনে তিনি একটা দিন ঠিক করে নিয়েছেন। যেদিন তাঁর রোগের দুই সপ্তাহ পুরবে, সেই দিনই তিনি নিজ মূর্তি প্রকাশ করবেন এদের কাছে।...কুকুর বিড়ালের মত ব্যবহার করেছে এরা তাঁর সঙ্গে! ভাবছে যে 'ফিডিং বট্‌ল্'-এ করে জলো মাখন তোলা দুধ খাওয়াচ্ছে রুগীকে—তার তাতেই ভবী ভুলবে! ভুলে গিয়েছে যে কুকুরে ফিরে কামড়াতেও জানে। করতে তো তিনি পারেন কত কিছু, নিজের অধিকারের মধ্যে থেকেও। নিজের রক্ত-জল-করা পয়সা বাপের কাছ থেকে পাওয়া এক পয়সাও নয়—এগুলোকে তিনি যথেচ্ছ দান করে দিয়ে যেতে পারেন—কারও কিছু বলবার নাই। ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র করতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে, বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোর্টে নালিশ করতে পারেন। আবার বিয়ে পর্যন্ত করতে পারেন, এই বুড়ো বয়সেও। কিন্তু অতদূর তিনি যেতে চান না। অন্যের চোখে ছোট হতে হয় এমন কাজ তিনি করতে চান না—অধিকার থাকলেও। এরা তাঁর কাছে ন্যায় বিচারই পাবে। নিক্তিতে ওজন করে তিনি ন্যায় বিচার করবেন স্বার্থপর, নাচুনে, হুজুগেমাতা, নিমকহারম স্ত্রীপুত্রদের উপর! তিনি যার উপর যতই বিরক্ত থাকুন, তার জন্য কাউকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না। অত নীচ তার মন নয়। হ্যাঁ আর একটা কথা, ওরাও যেন ভাববার অবকাশ না পায় যে ওদের ওপর অবিচার করা হয়েছে। হিসাব করে হাতে-কলমে ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে ওরা প্রত্যেকে তার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছে। বিষয়টা অতি সরল। 'এ্যাকাউন্ট সুট' এর মত শুধু হিসাবনিকাশের ব্যাপার।...

পনের দিনের দিন সকাল বেলায় উঠেই, তিনি বাড়ির চাকরকে ডাকলেন চীৎকার করে। স্ত্রী জপে বসেছিলেন। উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি? কেন?"

চাকরটাও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীদামবাবু তাকে বললেন —দেওয়ালের খান কয়েক ছবি নামিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে। সাবিত্রী-সত্যবানের ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো সোনার জলে লেখা 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ' শ্লোকটা, আর গ্রুপ ফটোখান, তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। স্ত্রী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, ছেলেমেয়েরা দোরগোড়া থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছে। কেউ কোন কথা বলছে না। রুগীর আবদার রাখতে সকলে উদ্‌গ্রীব। যাতে তাঁর মন ভাল থাকে তাই তিনি করুন। নরেন ডাক্তার বলে দিয়েছে, এমন কিছু যেন করা না হয়, যাতে রুগীর উদ্বেগ দুশ্চিন্তা বাড়ে।

এইবার তিনি ছাতের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন— "একবার যেন কম্পাউণ্ডারবাবুকে খবর দেওয়া হয়। আর নরেনবাবুকে যেন বারণ করে দেওয়া হয়, আমাকে দেখবার জন্য আসতে।"

গলার স্বরে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা এনে বলা। বুঝিয়ে দিলেন যে এখন থেকে রাশ নিজের হাতে নিলেন। যতই রুগ্ন ভাবুক এরা তাঁকে, নিজের দায়িত্ব নিজের হাতে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে এখনও। নিজের বাড়িতে নিজের মত থাকবার অধিকারে কারও হস্তক্ষেপ তিনি আর বরদাস্ত করবেন না।

ইচ্ছা করে অতিরিক্ত খাতির দেখিয়ে, নরেন না বলে নরেনবাবু বলেছেন তিনি। কথার সুর এবং চাউনির ভঙ্গি সৃষ্টিধরের মার কাছে একটু দুর্বোধ্য ঠেকল। ছেলের সঙ্গে তিনি গিয়ে পরামর্শ করলেন। নরেন ডাক্তারকে তখনই সব কথা বুঝিয়ে বলা হল। সে ঘরের ছেলের মত; তার কাছে বাড়ির কথা বলতে কোন সঙ্কোচ নাই। ঠিক হল সে নিয়মিত আসবে শ্রীদামবাবুর বাড়ি, কিন্তু রুগীর ঘরে ঢুকবে না। রুগীর মন খুশী রাখবার জন্য কম্পাউণ্ডারবাবুই দেখুন। দরকার বুঝলে এবং কম্পাউণ্ডারবাবু তার কথা শুনলে, সে বাইরে থেকে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে দেবে। সে সৃষ্টিধরের মাকে বলে দিল এখন থেকে রুগীকে একটু চোখে চোখে রাখতে।

এইবার শ্রীদামবাবু এক নাতির নাম ধরে ডাকলেন। সৃষ্টিধর গিয়ে দাঁড়াল কাছে।

"বাবা, কিছু বলছেন?"

অন্যদিকে তাকিয়ে শ্রীদামবাবু বললেন—"নীচের ঘরের আলমারি থেকে পুরনো হিসাবের খাতাগুলো নিয়ে আসা দরকার একবার।"

"এখন কিছুদিন যেতে দেন না ওসব জিনিস! আগে ভাল করে সুস্থ হয়ে নিন। তারপর ওসব আবার করবেন।"

"যার আনবার ইচ্ছা নাই তাকে তো আমি ডাকিনি।"

"কোন কোন বছরের আনব?"

"যতগুলো আছে সবগুলো। আর একটা পেন্সিল।"

মা ছেলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। এই সব করে আবার অসুখ বাড়িয়ে না ফেলেন বাড়ির কর্তা।

একরাশ খাতাপত্র এল নীচে থেকে।...চাকরের কাঁধে করে উপরে আনিয়েছে সৃষ্টিধর!...নিজে আনতে বাধে! বাপের পয়সায় ফুটানি। ধুলো আর মাকড়সার জাল ঝেড়ে আনতে হয় সে কথাটাও কি এদের বলে দিতে হবে!...

সৃষ্টিধর হাসিমুখে একটা সুখবর দিল বাবাকে। মানহানির মোকদ্দমায় তিনি জিতেছেন; হাকিমের রায় বেরিয়েছে; ব্যারিস্টার সাহেবের এক টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে; অর্থদণ্ডের পরিমাণটার কোন গুরুত্ব নাই; আসল প্রশ্ন হারজিতের।

হ্যাঁ না কিছুই বললেন না শ্রীদামবাবু। মানহানির মোকদ্দমার ফলাফলের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

তিনি ভাবছেন যে ছেলে খোশামোদ করে তাঁর মন গলাতে চায়। পুরনো হিসাবের খাতাগুলো আনাতে দেখে একটা কিছু সন্দেহ করে থাকবে। যাক! করে থাকলে করেছে! আপনার লোক সব! আত্মীয়-স্বজন না ছাই! 'কলিং বেল' দেখাতে এসেছিল আমাকে আমারই পয়সায়! ঘণ্টা বাজিয়ে এঁদের পূজো করতে হবে, তবে

এদের আবির্ভাব হবে!···তাঁকে যদি মাখনতোলা দুধ খেয়ে থাকতে হয় সারাজীবন!···গম্ভীরভাবে তিনি কাগজ পেন্সিল হিসাবের খাতা বালিশের উপর নিয়ে, চোখে চশমা এঁটে বসলেন। তাঁর প্রতিদিনকার আয়ব্যয়ের হিসাব লেখা আছে এইসব খাতাগুলোতে। সেই হিসাবগুলো থেকে বেছে বেছে কি সব যেন টুকে রাখছেন কাগজে।

কম্পাউণ্ডারবাবু আসায় বাধা পড়ল। ইনি নরেন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার নয়। এক সময় কোথায় যেন কম্পাউণ্ডারি করতেন; এখন স্বাধীন হাতুড়ে ডাক্তার। এসেই প্রথমে জেনে নিলেন, রুগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন কিনা।·· যদি সুস্থ বোধ করেন, আর হজম যদি হয়, তবে যা ইচ্ছা খেতে পারেন। কি খেতে ইচ্ছা করছে? লুচি?···

নিজে সম্মুখে বসে, লুচি বেগুনভাজা খাইয়ে তবে তিনি গেলেন। তাঁর এ ব্যবস্থা সৃষ্টিধরের মায়েরও মনঃপূত। কম্পাউণ্ডারবাবু চলে যাবার সময় রুগী তাঁকে বলে দিলেন উকিলবাবুকে একটা খবর দিয়ে দিতে। বিকালের দিকে আসবার জন্য। উইল লেখাতে হবে তাঁকে দিয়ে। বাড়ির লোকদের দিয়ে উকিলবাবুকে ডাকাতে ভরসা পান না তিনি। আসবার আগে উকিলবাবু যেন আইনের ধারাগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

"উইল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। উইল। অত চোখ বড় বড় করছেন কেন উইল শুনে? কাজটা করতে না পারেন তো বলুন পরিষ্কার করে।"

"না না। আমি উকিলবাবুকে খবর দিতে যাচ্ছি এখনই।"

সেখান থেকে পালাতে পেরে বাঁচলেন কম্পাউণ্ডারবাবু।

সৃষ্টিধরের মা নিজে হাতে রেঁধে সেদিন পলতার বড়া, লুচি, আর ছানার ডালনা স্বামীকে খাওয়ালেন। কর্তা খেলেন; খেতে ভালও লাগল; কিন্তু ভাব দেখালেন যেন শুধু কর্তব্যের খাতিরে খাচ্ছেন।

খাওয়াদাওয়ার পর অন্যদিন একটু ঘুমোন। আজ সে ফুরসত নাই। সারাদিন চলল ওই হিসাবপত্র লেখাপড়ার কাজ।

একটাও কথা বলেন নি। এক শুধু তিনটে-চারটের সময় একবার চাকরকে ডেকেছিলেন, সৃষ্টিধর সেই ঘরে বসে থাকা সত্ত্বেও। চাকরকে হুকুম দিয়েছিলেন—ঘরের মধ্যে একখানা টেবিল, ও একখানা চেয়ার এনে রাখতে। বাড়ির লোকে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল তাঁর রকম-সকম দেখে। রুগীর সব খবর খুঁটিয়ে বলবার জন্য সৃষ্টিধর নরেন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। সৃষ্টিধরের মা গিয়ে বসেছিলেন বালিশের পাশে পাখা হাতে নিয়ে। অমনি রুগীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি শুলেন না। আড়ষ্ট হয়ে, পেন্সিল হাতে নিয়ে বসে থাকলেন অন্য দিকে তাকিয়ে। মরে গেলেও তিনি স্ত্রীর দিকে তাকাবেন না, এই তাঁর সংকল্প।

"দাদু! উকিলবাবু এসেছেন।"

ছোট নাতি দোরগোড়া থেকে সংবাদ দিল। নিজের অজ্ঞাতে সৃষ্টিধরের মা মাথার কাপড় টেনে দিলেন, খাট থেকে ধড়মড় করে নামবার আগে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হঠাৎ নজরে পড়ে গেল শ্রীদামবাবুর। কিসের মত যেন রঙ সিঁথির সিঁদূরটার? ঠিক মনে পড়ছে না। পচা মাংসের মত কিংবা বুড়ো শকুনের ঘাড়ের ঝুঁটিটার মত। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। শিউরেও উঠে সর্বশরীর। মুহূর্তের জন্য বুকের ভিতরটা অবশের মত হয়ে যায়। বালিশে হেলান দিয়ে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন যাতে সৃষ্টিধরের মা বুঝতে পারেন যে, স্বামী ইচ্ছা করে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

"উকিলবাবু! এই রোগভোগের মধ্যে আবার উকিলবাবুকে দিয়ে কি হবে? না না, বারণ করে দিগে যা! যা বলবার সৃষ্টিধরকে তুমি ভাল করে বুঝিয়ে দাও! কাছারির মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে যদি কিছু বলবার থাকে তো সেকথাও ছেলেদের কাউকে বল না কেন!"

অধিকার ফলাতে এসেছে সৃষ্টিধরের মা! স্ত্রীর কথায় কান না

দিয়ে নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"টেবিলের উপর কাগজ-কলম সব ঠিক আছে তো? আর একখান বড় দেখে বইটই গোছের কিছু রাখতে বলেছিলাম না? আছে সব ঠিক? তাহলে এবার উকিলবাবুকে আসতে বলে দাও।"

সৃষ্টিধরের মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। উকিলবাবুর সঙ্গে নীচে নরেন ডাক্তারের দেখা হয়েছে। তিনি বলে দিয়েছেন রুগীকে যেন বেশী কথা বলান না হয়। "এই যে।"

"নমস্কার! মোকদ্দমাটাতে তো আমাদের জিত হয়েছে।"

নাতির সঙ্গে উকিলবাবু ঢুকেছেন ঘরে। এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, সেকথা বোঝবার বয়স এখনও ছেলেটির হয়নি। কিংবা হয়ত বাড়ির লোকরা তাকে এখানে থাকতে বলেছে, যদি ফাই ফরমাশের জন্য দরকার হয় সেকথা ভেবে।

শ্রীদামবাবু নাতিকে চলে যেতে বললেন ঘর থেকে। "উকিলবাবু দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসুন। কম্পাউণ্ডারবাবু নিশ্চয়ই সব কথা বলেছেন আপনাকে। আমি উইল করতে চাই।"

প্রথমেই কাজের কথা পেড়েছেন; মোকদ্দমায় হার-জিত নিয়ে বাজে কথা বলবার সময় নাই তাঁর এখন! উকিলবাবু বুঝে গিয়েছেন তাঁর মনের ভাব। কর্মতৎপরতা দেখাবার জন্য কাগজে খস খস করে উইল লিখবার বাঁধা গৎ এক লাইন লিখলেন।

"ও কি লিখলেন, আমি না বলতেই?"

"লিখলাম ইহাই আমার শেষ উইল।"

বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পেল বৃদ্ধর চোখমুখে।

"না! আপনি একটা একেবারে…! এখন তো একটা মোটামুটি খসড়া লিখতে হবে শুধু। টাইপ করতে হবে, দুজন সাক্ষীর দরকার হবে, রেজিস্ট্রার সাহেবকে আসবার জন্য খবর দিতে হবে—সেসব এখন কোথায়? এখন শুধু নোট করে নিন মোটামুটি। আমি পয়েন্ট দিচ্ছি। দশ টাকা দেবো আপনাকে, বুঝলেন? লিখুন! আমার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সৃষ্টিধরের বয়স সর্বাপেক্ষা অধিক। সেইজন্য

সে সর্বাপেক্ষা বেশীদিন আমার অন্ন ধ্বংস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। হ্যাঁ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যহারে কথাটাও লিখে দেবেন। তাহার বয়স আজ সাতচল্লিশ বৎসর সাত মাস পাঁচদিন। উকিলবাবু পরে এই দিনটা ঠিক করে বসিয়ে নেবেন। ইহার ভিতর বিশ বৎসর পিতা হিসাবে আমি তাহাকে লালনপালন করিতে বাধ্য। উকিল-বাবু, এটাকে বিশের জায়গায় বাইশ বছর করে দেওয়া যাক—কি বলেন? অন্যায় অবিচার আমি কারও উপর করতে চাইনা, বুঝলেন। সৃষ্টিধরের যা প্রাপ্য, তার থেকে এই পঁচিশ বছর পাঁচ মাস সাত দিনের খাইখরচা বাবত পনর হাজার টাকা বাদ যাবে। ওর বিবাহ হয়েছে চব্বিশ বছর হল। স্ত্রীর খাইখরচ বাবত চৌদ্দ হাজার চারশ টাকা। ওদের বড় ছেলের কলেজে পড়া ও খাইখরচ বাবত চৌদ্দ হাজর টাকা। ওদের বড় মেয়ের খাইখরচ ও বিবাহাদি বাবত পঁচিশ হাজার টাকা। ওদের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের খরচ বাবত সাতাশ হাজার টাকা। বউমার ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ামে চিকিৎসা বাবত ছয় হাজার টাকা। সব মিলিয়ে হল এক লক্ষ এক হাজার ছয়শ টাকা। এই টাকাটা ওর প্রাপ্য টাকা থেকে বাদ দিতে হবে। আর আমারও কিছু দেনা আছে সৃষ্টিধরের কাছে। এইমাসের ওর মায়ের চিকিৎসার জন্য নরেন ডাক্তারের ফি বারো টাকা। নরেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওর মায়ের মেটে সিদূঁরের দরুণ ছয় আনা। কোর্টে জ্বর আসায় আমাকে একদিন ও ওর ইন্সিওর কোম্পানির দেওয়া গাড়িতে বাড়ি নিয়ে এসেছিল —তার দরুন গাড়িভাড়া দুই টাকা। মোট এই চৌদ্দ টাকা ছয় আনা আমার দেনা ওর কাছে। এটা যেন ওকে দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা এ তো হল। এইবার আমার স্ত্রীরটা লিখে নিন। মাসে ষাট টাকা করে পান এই রকম একটা অ্যান্নুইটির ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয় তাঁর জন্য। এতেই ওঁর চলে যাওয়া উচিত, কি বলেন? আচ্ছা না হয় মেটে-সিদূঁর বাবত ছয় আনা করে আরও বেশী লিখে রাখুন। ষাট টাকা ছয় আনা করে উনি মাসহারা পাবেন।”

এতক্ষনে উকিলবাবু কথা বলেন—"ওঁর তখন তো সিদূঁর লাগবে না।

চটে উঠেছেন শ্রীদামবাবু—"আপনার উপদেশ আমি চাইনি! যা বলছি তাই লিখুন। আমি সিদূঁর বলিনি; মেটে-সিদূঁর বলেছি। সিদূঁর আর মেটে-সিদূঁর এক জিনিস নয়। মেটে-সিদূঁর ইচ্ছা করলে বিধবারাও ব্যবহার করতে পারেন। বিধবা হবার চেষ্টাতেও সধবারা ব্যবহার করতে পারেন—নিজেদের স্বার্থ থাকলে! আসল সিঁদূর ব্যবহার করলে তো কোন কথাই ছিল না।"

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন শ্রীদামবাবু কথাগুলো বলতে বলতে। বারান্দার জানালার পাশে খুট করে একটা শব্দ হল। উকিলবাবু তাকালেন সেদিকে। বোধহয় বাড়ীর লোকরা আড়ি পেতে শুনছে।

"দেখুন উকিলবাবু বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে এত সব কথা বলে। জলের গ্লাসটা দেবেন তো ওখান থেকে। ঘিয়ের জিনিস খেলেই বড় জলতেষ্টা পায়।"

"আচ্ছা থাক এখন তবে। অন্য সময় আসবো আবার।"

"সেই ভাল। আচ্ছা, এই কাগজখান রাখুন। আমার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের আলাদা আলাদা হিসাব লেখা আছে এতে। আর উল্টো পিঠে আমার সম্পত্তির তালিকা নোট করা আছে। বুঝেই তো গেলেন আমি কেমন ভাবে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাই। কালকে এই অনুযায়া একটা মোটামুটি খসড়া লিখে আনবেন আপনি। তারপর দেখা যাবে।"

দুম দুম করে দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ হ'ল। উকিলবাবু কাগজপত্র ফাইলে বেঁধে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। উঠে দরজা খুলে দিলেন।

সৃষ্টিধরের মা।

বাড়ির অন্য লোকরা দরজা ধাক্কা দেওয়া থেকে তাঁকে বিরত করবার চেষ্টা করছিলেন। বাড়ির মেয়েদের দেখে উকিলবাবু একটু পাশ

কাটিয়ে সরে দাঁড়ালেন। হেঁপো রুগীর ছিপছিপে গড়ন সৃষ্টিধরের মায়ের। ছুটে গিয়ে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন স্বামীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টগোছের হয়ে গেল শ্রীদামবাবুর সর্বশরীর।

"এ তুমি কি বলছ! ঘুণাক্ষরেও যদি টের পাই যে, এতে তোমার আপত্তি, তাহলে কি আমি মেটে-সিদুঁর ব্যবহার করি!"

আড়িপাতার জন্য কোনরকম সঙ্কোচ নাই; উইলে কম টাকা পাবার জন্য অনুযোগ নাই; কেবল আছে মেটেসিদুঁর ব্যবহার করবার জন্য অনুতাপ। এ জিনিস শ্রীদামবাবুর নজর এড়ায় না। কিন্তু এ অনুতাপ পর্যাপ্ত নয়। অনুতাপের কারণ বলছেন, স্বামীর আপত্তির কথা টের পান নাই বলে। কিন্তু এ তো শুধু স্বামীর আপত্তির কথা নয়; স্বামীর মারাত্মক অমঙ্গলের আশঙ্কা সত্ত্বেও স্বার্থত্যাগ না করবার জন্য অনুশোচনা হওয়া উচিত ছিল। তবু এতে মনের ক্ষোভ খানিকটা কমে; প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষাটা নরম হয়ে আসে। যেখানে আগে সাবিত্রী-সত্যবানের ছবিটা ছিল সেইখানটাতে তাকিয়ে রয়েছেন শ্রীদামবাবু। বাড়ির সকলেই এসে জুটেছে এই ঘরে; কিন্তু কারও সাহস নাই এর মধ্যে কোন কথা বলবার। উকিলবাবু চলে যাবার সময় নীচের ঘরে নরেন ডাক্তারকে রুগীর আধুনিকতম সংবাদ দিয়ে গেলেন।

সৃষ্টিধরের মা অঝোরে কেঁদে চলেছেন—"ওগো তুমি একবার বললে না কেন মুখ ফুটে। আমরা কতটুকু কি বুঝি! পোড়াকপাল, নইলে এই দুর্বুদ্ধি হয়।"

স্ত্রী কি বলছেন, সেটা সম্বন্ধে রুগীর ঔদাসীন্য ক্রমেই কমছে। শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা আস্তে আস্তে কাটছে। ক্ষোভের স্থান নিচ্ছে অভিমান।

"কি কুক্ষণে যে সেদিন নরেন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! তুমি বলে দিতে যাবে কেন। আমার নিজেরই বোঝা উচিত ছিল। নরেনের কথা শুনে আমার নেচে উঠা উচিত হয়নি। কপাল! আমি

মুখ্যু মানুষ। ভুলে কি করে ফেলেছি। সেকথা কি মনে গিঁট দিয়ে রেখে দিতে হয় চিরকাল ?"

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না শ্রীদামবাবু।

"এ আমার মনে রাখবার বা ভুলে যাবার কথা নয়! এ হচ্ছে আমার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল; তাতেও তোমাদের নজরে পড়ল না? যখনই তুমি আসল সিঁদুর ছেড়ে নকল সিঁদুর দিলে সিঁথিতে, তখনই যে আমার হার্টের ব্যথাটা আরম্ভ হয়েছিল, একথা কি আমি লাঠি মেরে তোমার গোবরভরা মাথায় ঢুকিয়ে দেবো, তবে বুঝবে?' এতক্ষণে তিনি তাঁর সঙ্কল্প ভুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছেন। দুঃখে, ব্যথায়, অভিমানে বৃদ্ধের চোখে জল এসে গিয়েছে। মানসিক উত্তেজনায় তিনি ঠক ঠক করে কাঁপছেন। শ্বশুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করেন এক পুত্রবধূ। বড়ছেলে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন সৃষ্টিধরের মা। এত অপ্রস্তুত তিনি জীবনে কখনও হননি এর আগে।

...স্বামীর অমঙ্গলের জন্য দায়ী তিনি? নিজের কপাল নিজের হাতে পোড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। এ যাত্রা বুড়োশিব রক্ষা করেছেন! তাঁর ভুল শোধরাবার জন্য সময় দিয়েছেন! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত না। প্রতি মুহূর্তের দাম আছে এখন।..."আমি এখনই এ সিঁদুর মুছে সিঁথিতে আসল সিঁদুর দিয়ে আসছি।"

ছুটে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধা ঘর থেকে। পিছনে পিছনে বড় বউমাও গেলেন, বোধ হয় শাশুড়ীকে সাহায্য করবার জন্য।

ঘটনার এই তীব্র গতিবেগ বোধ হয় শ্রীদামবাবুরও প্রত্যাশিত ছিল না। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন দরজার দিকে; অথচ বোঝা যাচ্ছে যে কিছু দেখছেন না। হঠাৎ একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ল সে চাউনিতে। তাঁরও খেয়াল হয়েছে একটা কথা। এত

রকমের কথা চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে ভাবেন.কিন্তু এ দিকটার কথা তিনি এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত ভাবেননি।…সংকট মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি চোখের সম্মুখে।…সাদা চুলের মধ্যে টাকপড়া সিঁথি।…বড় বউমা একখানা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সেই চরম মুহূর্তকে এগিয়ে আনছেন!…ঠিক যে মুহূর্তে মেটে-সিঁদুরের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গিয়ে সিঁথিটা একেবারে সাদা হয়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে!…সেই মুহূর্ত আর সিঁথিতে আসল-সিঁদূর দেবার সময়ের মধ্যে যে ক্ষণিকের ব্যবধান সেইটেই তাঁর সঙ্কট-মুহূর্ত। সেই মুহূর্তটার জন্য ওত পেতে রয়েছে আড়ালে শত্রু; নিঃশব্দ সঞ্চারে অন্ধকারের মধ্যে সেইদিকে এগিয়ে চলেছে! আর নিস্তার নাই! ইচ্ছা হল চীৎকার করে ডেকে সৃষ্টিধরের মাকে এখনও একবার বারণ করেন। পারলেন না।…বুঝল না সৃষ্টিধরের মা যে এরকম একটা ব্যাপারে ভাববার জন্য একটু সময় পাওয়ার দরকার ছিল।…ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছেন তিনি। সর্বশরীরে আতঙ্কের সাড়া লেগেছে। মেজবউমা পাখা করছেন জোরে জোরে। তবু বড় গরম লাগছে।…সমস্ত শরীরের মধ্যে আনচান করছে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি।… এই বুঝি বড়-বউমা নেকড়া ভিজাল ?…এই…এই বুঝি !…বুকের কাছটায়…

ভাবলেন আঙুল দিয়ে দেখাবেন বুকের দিকে। হাত তুলতে পারলেন না।…তাহলে…

ভয় পেয়েছে সকলে। মুখ চোখের ভাব দেখে ভয় পেয়েছে সৃষ্টিধর।

নরেন! নরেন! শীগগির!…আর তুই যা দৌড়ে! অক্সিজেনের যন্ত্রটা পাশের ঘরে আছে। ভিড় কর না এখানে! জোরে পাখা কর! জানলা দরজাগুলো সব ভাল করে খুলে দাও!

বাবা! বাবা! কোথায় কষ্ট হচ্ছে? বাবা! ও বাবা!

বাবার বুকের উপর হাত রাখল সৃষ্টিধর।

কণ্ঠকণ্ডুতি

মাইক-এর নীচের একটা টিনের চাকতির উপর বড় বড় করে লেখা "জিরানিয়া-কোয়ল", অর্থাৎ জিরানিয়া জেলার কোকিল। যে দোকান থেকে মাইক আর লাউডস্পীকার ভাড়া করা হয়েছে সেই দোকানের নাম। আবার যাঁর দোকান তাঁরও নাম ওই, লোকে সংক্ষেপে বলে কোয়লজী। শহরের সবাই দেখেছে, সেই দোকানের সাইনবোর্ডের নীচেই ঝোলান থাকে একটা খাঁচা, সকালে বিকালে। খাঁচার বাসিন্দা একটা পোষা ঘুঘু পাখি। অদ্ভুত শখ কোয়লজীর। ত্রিভুবনে আর কেউ কোথাও ঘুঘু পুষেছে কিনা সেকথা এখানকার কারও জানা নাই। তারা জিজ্ঞাসা করে—একটা কোকিল পুষলেন না কেন? তাহলে তবু সাইনবোর্ডের নামটার সঙ্গে একটু সঙ্গতি থাকত। কোয়লজী জবাব দেন না, শুধু মৃদু হাসেন। কথা তিনি পারতপক্ষে বলতে চান না। কেন চান না সেকথা শহরের কারও অজানা নয়।

খানিক আগেই আর একবার "মাইক" খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মজবুত কোরা-কাপড় ছেঁড়বার সময় একরকম শব্দ হয় না? ফ্যাঁশ—চিড়-চিড়-চড়াক? সেইরকম লাগছে "মাইক"-এ ফাটা ফাটা গলায় বলা অস্পষ্ট কথাগুলো। কি যেন একটা ধরবার জিনিসের অভাবে ফসকে আলগা-আলগা হয়ে যাচ্ছে গলার স্বরটা। অভ্যস্ত কান না হলে বোঝা শক্ত কী বলছে। আমার অবশ্য কোয়লজীর কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এক সময় আমরা সহকর্মী ছিলাম। এখনও মাঝে মাঝে ওর রেডিও, লাউডস্পীকারের দোকানে গিয়ে বসি। নিজের নিজের সুখ-দুঃখের গল্প করে আজও মনের বোঝা হাল্কা করি আমরা। আজকাল ও সাধারণত কথা বলে ফিস-ফিস করে। সে সময় ওর কথা বেশ বোঝা যায়। বোধহয় ওর ঠোঁটনাড়ানোটা কাছ

থেকে দেখতে পাওয়া যায় বলে কথাগুলোকে অত স্পষ্ট মনে হয় তখন। এখন মাইকের সম্মুখে দাঁড়িয়েও সেই রকম আস্তে কথা বলছে না কেন। তাহলে হয়ত ওর গলার স্বরের বিকৃতি মাইকে শতগুণ বড় হয়ে এমনভাবে শ্রোতাদের কানকে পীড়া দিত না।

"এক। দুই। তিন।"

বলছে ত এই কথা কয়টিই বারে বারে। এর জন্যে আবার এত বাবরি-চুল নাড়াবার ঘটা কিসের। যাত্রার মত এমন গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলবারই বা দরকার কী। আজকে তার হল কি। অন্য কোন সভাসমিতিতে তো ও "ফিট" করবার সময় মাইকের কাছে যায় না—এক, দুই, তিন বলবার জন্য। ও চিরকাল বসে থাকে দূরে, অ্যামপ্লিফায়ারটার কাছে। সেখান থেকে বোতাম টিপে মিস্ত্রির এক-দুই-তিন বলার স্বর নিয়ন্ত্রণ করে। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সভাসমিতিতে মাইক ভাড়া দেবার কাজ তাকে নিতে হয়েছে, কিন্তু কতকগুলো অযোগ্য বক্তার গলার স্বরের দুর্বলতা ঢাকবার যন্ত্রটাকে সে চিরকাল অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। যন্ত্রটা তার অন্নদাতা, দুর্দিনে উচ্ছিষ্ট অন্ন দিয়ে সাহায্য করছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য এটাকে পূজো করতে পারে না, এই ছিল কোয়লজীর মনের ভাব। জানি ত তাকে।

"হেল্লো। হ্বান। টো। থিরি।"

মিস্ত্রিটাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে পারত কথা কয়টা। কথা না বলে, শুধু তুড়ি বা হাততালি দিয়েও তো পরীক্ষা করতে পারত মাইকটা ঠিক কাজ করছে কিনা।

লোকজন এসেছে বেশ। শামিয়ানার মধ্যে আঁটেনি। কম্পাউণ্ডের বাইরে গেট ছাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, অগণিত লোকের মাথা মনে হচ্ছে জমে চাপ বেঁধে গিয়েছে। বাঁ পাশের বারান্দায় চিকের আড়ালে মহিলারা আছেন। বেদীর পিছনের দিকে সাওজীর বাড়ীর অন্দরমহলের একটা দরজা। এতগুলি অধৈর্য ব্যক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টি গিয়ে কেন্দ্রিত হচ্ছে কোয়লজীর দিকে। দোকানের সুনাম ও

কোয়লজীর সম্মান আর বুঝি অক্ষুণ্ণ রাখা গেল না। তবু তার ভাবভঙ্গীতে, বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। আমি প্রথম সারিতে বসেছি কি না তাই সব খুঁটিয়ে দেখতে পাচ্ছি।

গাঁদাফুলের মালা-গলায় মিসিরজীর আঙুল এখনও রামায়ণের পুঁথির উপর। ক্ষমাপূর্ণ চোখে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন মাইকের কাছের অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিত লোকটির দিকে। জনকপুরের বিখ্যাত রামায়ণদলের দলপতি ইনি। দেশজোড়া এঁর রামায়ণগানের খ্যাতি। সাধক-ভক্ত বলেও এঁর নাম আছে। এই জনকপুর রামায়ণ কোম্পানির জন্য লোকরা রাম-রাবণ সেজে যুদ্ধ করে, সখী সেজে নাচে, মিসিরজীর দম ফুরিয়ে এলে গান গায়। মিসিরজী নিজে কোন দিনই এই অভিনয়-গুলোতে নামেননি। গান ছাড়া শুধু নৃত্যারতি দেখাতেন মাথা-থালায় একশ-আটটা প্রদীপ নিয়ে। বুড়ো হয়ে আজকাল আর নাচতে পারেন না। দলের সঙ্গে বাইরে যাওয়াও আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। গলার সে জোর আর নাই। বহু টাকা পেলে যদিই বা কোথাও যান, আগে থেকে বলে দেন যে লাউডস্পীকার ফিট করান চাইই চাই। তাই ডাক পড়েছিল জিরানিয়া-কোয়লের। এর আগে কখনও সাওজীর বাড়ির রামনবমীর উৎসবে মাইক ফিট করবার দরকার পড়েনি। বুড়ো সাওজী বহু ছেলেমেয়ে নাতিপুতি রেখে গত বছর স্বর্গে গিয়েছেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী, পয়সা খরচ করে যতদূর পুণ্য সঞ্চয় করা যায় তাতে ত্রুটি রাখতে চান না। সেইজন্যেই এবার এত খরচ করে মিসিরজীকে আনান হয়েছিল। জনকপুর রামায়ণ কোম্পানিতে নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকলে কি হবে। ভক্তিমতি বিধবা বলেছেন সেসব হবে কাল, ওসব ভেজাল আজ নয়, এত বড় একজন সাধক-ভক্তকে যখন পাওয়া গিয়েছে, রাম-নবমীর দিনে, তখন যতটুকু যা পারেন মিসিরজী একাই করবেন। সেইজন্যই আজ এত ভিড়।

যাক! মাইক ঠিক হয়ে গিয়েছে। রামায়ণ গান আবার আরম্ভ

হল। শ্রোতাদের সঙ্গে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে লোকের চেঁচামেচিতে ভাল করে গান শোনবার উপায় নেই। পাশের যুবকের দল এক মিনিটের জন্যও নিজেদের কথাবার্তা বন্ধ করেনি। বেদীর পিছনে কিছু দূরে অন্দরমহলের দরজার দিকে "অ্যামপ্লিফায়ার"টা রাখা অছে। কোয়লজী গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেইখানে। কিছুক্ষণ পরে বসল আরাম করে। এতক্ষণে বোধহয় সে মাইক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। বসে বসে পা নাচাচ্ছে আপন মনে। আর গান শুনতে শুনতে অ্যামপ্লিফায়ার-এর বাক্সটার উপর আঙ্গুল দিয়ে তাল দিচ্ছে। আজকাল সবাই তাকে সঙ্কোচকাতর, গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলেই জানে। সেজন্য এখনকার এই লঘু চাপল্যটুকু লোকের নজরে পড়বার কথা।

চিরকাল কিন্তু সে এরকম গম্ভীর প্রকৃতির ছিল না। রাজনীতিক জীবনে থাকবার সময় তার উচ্ছল উৎসাহ ও চটুল কর্মব্যস্ততা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তার উপর আবার চেহারাটি ভাল, মাথায় বাবরি চুল, একটু নাটুকে ভাব। আমরা অনেক সময় ঠাট্টা-তামাসা করতাম সভা-সমিতিতে তার এই অকারণ কর্মব্যস্ততা নিয়ে; কিন্তু সেসব ত বহুকাল আগেকার কথা। তখন বয়স ছিল কম; শোভন-অশোভনের মান ছিল আলাদা; দশজনের, বিশেষ করে দলের উপরওয়ালাদের নজরে পড়াটাই ছিল জীবনের লক্ষ্য। এখন কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করবার জন্যই কোয়লজী দোকানটা চালায়; কিন্তু আজ একটু অন্যরকম অন্যরকম লাগছে তাকে। সকাল থেকেই। ভোরবেলাতেই আমার বাড়িতে গিয়েছিল, মিসিরজীর গান শুনতে যাবার জন্য অনুরোধ করতে। বলেছিল, এ-সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। কোথায়? শাওজীর বাড়ীতে? এতকাল পরে আবার? সেই আস্তাবলে নয়ত? আমার পরিহাসের উত্তর দিয়েছিল কোয়লজী তার মুখের সলজ্জ হাসিটুকু দিয়ে। তারপর বিকালে আসবার সময় আমাকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে এসেছিল।

তার কৃপাতেই, প্রথম লাইনে বসবার জায়গা পেয়েছি এখানে। না এলেই ভাল ছিল। একটু ধর্মভাব না থাকলে শ্রোতার পক্ষে রামায়ণ গানের রস নেওয়া কঠিন। ধর্মকর্মের বালাই আমার নেই। অনুরোধে পড়ে এসেছি। কাজেই মিসিরজীর গান আমার বিশেষ ভাল লাগছে না। কানে আসছে; মাঝে মাঝে ভাল করে শোনবার চেষ্টা করছি; কিন্তু মন বসাতে পারছি না। যে দুইজন রামায়ণ-কোম্পানীর লোক মিসিরজীর দুপাশে বসে নেকড়া দিয়ে অনবরত তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে, তাদের মাসিক বেতনের পরিমাণ মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি। পাশের যুবকদলের রসাল টীকা-টিপ্পনীগুলো না শুনে উপায় নাই। শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনের উপর তারা নজর রেখেছে। যতবার মিসিরজীর চোখ মোছান হচ্ছে, ততবার নাকি তারাও যন্ত্র-চালিতের মত নিজেদের চোখ মুছছেন। ওরা ধরে ঠিকই। যে লোকটা মিসিরজীকে পাখা করছে, সে দেখলাম সত্যিই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। মোট কথা, এই সব নানা জিনিস মিলিয়ে গানের আসর বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ মাইক খারাপ হয়ে গেল আবার। মিসিরজী প্রথমটায় বুঝতে পারেননি; তিনি চোখ বুজে গান গেয়ে চলেছেন। পাশের লোক দুইজন তাদের চোখের জল মোছাবার ডিউটি বন্ধ করেনি। কানে এল যে শ্রোতাদের মধ্যেও কে কে যেন দেখাদেখি নিজের নিজের চোখের জল মুছে চলেছেন, মাইক অকেজো হবার পরেও। আমি কিন্তু দেখছি কোয়লজীকে। দৃঢ় পদক্ষেপে সে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাড়াচাড়া করে দেখছে যন্ত্রটার কোন অঙ্গ রোগগ্রস্ত। বেদীর কাছে গিয়ে মিসিরজীর পায়ে হাত দিয়ে গান থামাতে অনুরোধ করল বেশ সপ্রতিভ ভাবেই। আবার গেল অ্যামপ্লিফায়ারটার কাছে। মুখ-চোখ দেখে বোঝা গেল যে, এতক্ষণে সে রোগ নির্ণয় করতে পেরেছে। মিনিট খানেক এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে গিয়ে দাঁড়াল মাইকের সম্মুখে। মিস্ত্রিটা কোয়লজীর কাছে গিয়ে কি যেন বলছে। বোধহয়

দোকান থেকে আর একটা যন্ত্র নিয়ে আসবে কিনা, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছে। কিংবা হয়ত অন্য কোন বেফাঁস কথা বলেছে। নইলে কোয়লজী ওরকম চটে উঠবে কেন। না! না! না! কোয়লজী অনুমতি দেয়নি। আঙুল দেখিয়ে মিস্ত্রিটাকে অ্যামপ্লিফায়ারের কাছে বসতে বলল স্বর-নিয়ন্ত্রণের বোতামটা ধরে। মাথার এক ঝাঁকানিতে বাবরি চুল ছড়িয়ে নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে সে দাঁড়িয়েছে মাইকের সম্মুখে; ঠিক সেকালে যেমন করে দাঁড়াত। গেটের বাইরে সরকারী রাস্তা পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে সে দেখছে সম্মুখের অগণিত লোক-জনকে। একটু বুঝি আনমনা হয়ে গিয়েছে। তারপর চীৎকার করে মাইকে আরম্ভ করল—হেল্লো! হেল্লো! হ্বান! টৌ! থিরি!··· হেল্লো! হ্বান! টৌ! থিরি!

বেদীর উপর চেয়ারে উপবিষ্ট আড়ষ্ট রাম-সীতার মধ্যেও দৃষ্টি বিনিময় হল। পাশের লোকেরা হাততালি দিচ্ছে। একজন চীৎকার করে বলে ওঠে—"মধুর! মধুর!"

"প্রেম নিবেদন করছে রে!"

"গান গাইছে বোধ হয়।"

"হাপর চালাচ্ছে, হাপর!"

ছাত্রের দল নিশ্চয়ই। এরা বোধহয় বাইরে থেকে এসে এখানকার কলেজে নতুন ভর্তি হয়েছে। কোয়লজীর গলার স্বরকে নিয়ে এমন নির্দয় রসিকতা এখানকার কোন লোকের দ্বারা সম্ভব নয়। এই সেবারও ভোটের সময় জেলার হাজার হাজার লোকে স্বাক্ষর করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একখানা আবেদনপত্র দিয়েছিল—পুরাতন রাজ-নীতিক কর্মী জিরানিয়া কোয়লকে চিকিৎসার্থে সরকারী খরচায় ভিয়েনা পাঠাবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও অবশ্য আবেদনপত্রে কোন ফল হয়নি; কিন্তু এর থেকেই বোঝা যায়, এখানকার লোকে কিরূপ সম্ভ্রম ও স্নেহের চোখে দেখে কোয়লজীকে।

কী করে যেন ভিয়েনা শহরের নামটাও কোয়লজীর নামের সঙ্গে

জড়িয়ে গিয়েছে ওর প্রথম অসুস্থতার সময়, যখন রাজধানীর হাসপাতালে ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন থেকেই। সেখানকার এক ডাক্তার বলেছিলেন যে ভিয়েনা ছাড়া আর কোথাও এ-রোগের চিকিৎসা হয় না। কোথা থেকে যে মানুষের কি বিপদ আসে। বিপদটা প্রথম এসেছিল একটা ইলেকশনের মরশুমে। শীতকাল। আমরা এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। একদিন সকাল বেলা সে বলল, ঢোক গিলতে লাগছে। পরের দিন থেকেই দেখা গেল, তার গলার স্বর বার হচ্ছে না। তার গলার কোন রোগের কথা এর আগে শুনিনি। বরঞ্চ মাথা ধরার কথা সে প্রায়ই বলত। আর বলত যে, বক্তৃতা দিতে ওঠবার মুহূর্তে তার কানে তালা লেগে যায় এবং গলার স্বরও অস্বাভাবিক তীব্র হয়ে ওঠে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তারপর মিনিট খানেক নিজের বক্তৃতার স্বর কানে এলে সে-ভাবটা কেটে যায়। এছাড়া আব কোন রকম গলার অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তার মুখে শুনিনি এর আগে।

ওষুধ-বিষুধ কিছুতেই ফল হল না। আমি আশ্বাস দিই—"ভয় কী। সেরে যাবে।" শুনে সে আমার হাত চেপে ধরেছিল। চোখে জল। আমার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়প্রত্যয়ের অভাবটাকে সে ধরে ফেলেছিল অনায়াসে। কণ্ঠধ্বনি নিয়ে কম মাথা ঘামায়নি তো কোয়লজী সারা-জীবন। কথার ধ্বনির মাদকতার স্বাদ পেয়েছিল সে ছোটবেলা থেকে। চানাচুরওয়ালার ছেলে কিনা! তখন ওর নাম ছিল বিরজু। চানাচুর বিক্রির কাজে বাবাকে সাহায্য করতে হত মেলার মরশুমে। এই চানাচুর বিক্রির সূত্রেই তাকে প্রথম অনর্গল কথার পর কথা সাজানর অভ্যাস আয়ত্ত করতে হয়। তার বাপের কথার বাঁধুনি ছিল বেশ। বাপ শিখিয়েছিল, "এক কলি গাইবার সময় নিজের বলা কথার আওয়াজটা নিজের কানে ধরে রাখবি। এই আওয়াজের মশলাতে গরমালে তবে না মন পরের কলির কথাগুলোকে বার হতে দেবে। কান দিয়ে ঢুকে কথার আওয়াজটা মনের মধ্যে থেকে

[illegible]প্রার্থীদের ঠেলে বার করে। তাই না সময়মত কথা যোগায় মুখে।"

বাপের শেখানো চানাচুর তৈরির প্রক্রিয়াটা তার জীবনে কোন কাজে আসেনি ; কিন্তু যখন-তখন মুখে মুখে কথা সাজাবার কৌশলটা বিরজু অবিচলিত নিষ্ঠায় আয়ত্ত করেছিল। তার দরাজ গলাও বাপের কাছ থেকে পাওয়া। বাপ তাকে গ্রামের পাঠশালায় ভরতি করিয়েছিল। সেখান থেকে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় একটা বৃত্তি পেয়ে সে এসে শহরের স্কুলে সবচেয়ে নীচের ক্লাসে' ভরতি হয়। বয়স তখন তের-চৌদ্দ। বক্তৃতা দেবার নেশা তার তখন থেকেই। তখনই সে দশজনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবার সুযোগ খোঁজে। তাই এই ছোট শহরের লোকজনের নজরে পড়তে ওর সময় লাগেনি। সেই সময় হল এখানে প্রাদেশিক যুব-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন। সভানেত্রী হয়ে যিনি এসেছিলেন, ভারত-জোড়া তাঁর নাম। ইংরাজী উর্দুতে ভাষণ দেবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। স্কুলের ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে বিরজু। বক্তৃতার মধ্যে সে সভানেত্রীকে ভারত-কোহলিয়া (ভারত-কোকিলা) বলে সম্বোধন করে। উত্তরে তিনি বিরজুকে জিরানিয়া-কোয়ল নামে অভিহিত করেন। সভাভঙ্গের পর ভারত-কোহলিয়া জিরানিয়া-কোয়লকে কাছে ডেকে পিঠ চাপড়ে আদর করেছিলেন। হাসতে হাসতে তাকে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কথার সুরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাগ্মিতার জোরে বিরজু নিশ্চয়ই দেশের একজন গণ্যমান্য নেতা হবে। জেলার লোকে বিরজুর জন্য গর্ব অনুভব করেছিল সেদিন। সেই থেকে বিরজু হয়ে গেল জিরানিয়া-কোয়ল…সংক্ষেপে কোয়লজী। সেই থেকে কোয়লজীর চোখের সম্মুখে স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলে গেল…তার ভাষণ শোনবার জন্য লোক ভেঙে পড়ছে…ফুলের মালা গলায় দিয়ে সে সারা দেশ সফর করে বেড়াচ্ছে…লোকে জয়ধ্বনি দিচ্ছে… খবরের কাগজে তার ফটো বার হচ্ছে…আরও কত রকমের কথা…

বক্তৃতা দেবার সহজাত ঝোঁকটা একটা লক্ষ্যের সন্ধান পেয়ে আরও জেঁকে বসল তার মনে। এতকাল সে সুযোগ খুঁজে বেড়াত পণ্ডিতজীর ফেয়ারওয়েল মিটিং-এ, স্কুলের প্রাইজ বিতরণ সভায় বা পাড়ার তুলসী-জয়ন্তী উৎসবে। কিন্তু এবার থেকে সে মাখামাখি আরম্ভ করল এক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। বক্তৃতা দেবার এমন সুযোগ-সুবিধা সেই প্রতিষ্ঠানের বাইরে তখন বিশেষ ছিল না।

এদিকটা তো সবই আশানুরূপ হল ; হল না শুধু পড়াশোনার দিকটা। যে-লোকটা যে-কোন বিষয়ের উপর অনর্গল বক্তৃতা দেবার মত বুদ্ধি রাখে, সে যে চেষ্টা করেও কেন কাজ-চালানো গোছের ইংরেজী রপ্ত করতে পাবল না, জানি না। সেই নীচের ক্লাসেই পর পর তিনবার ফেল করে তাকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়। সুবিধার মধ্যে দেশে তখন একটা জাতীয় আন্দোলনের হিড়িক চলছে। তারই মধ্যে বিরজু নিজেকে ডুবিয়ে দিল তখনকার মত।

সেই সময় থেকে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

মিসিরজীর রামায়ণ গান চলেছে। শ্রোতারা নড়েচড়ে আবার শান্ত হয়ে বসেছে। চিকের আড়াল থেকে ছোটছেলের একটানা কান্নার আওয়াজ, পাশের যুবকের দলের মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে। চিৎকার করে তারা ছেলের মাকে তাঁর বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করে দিল। কোয়লজী দাঁড়িয়ে রয়েছে পিছন দিকে অ্যামপ্লিফায়ার-এর কাছে। সে আজ খদ্দরের জামা-কাপড় পরে এসেছে। আগে খেয়াল করিনি। ইদানীং দেখতাম সে খদ্দর পরা ছেড়ে দিয়েছিল। আজ দেখছি তার সবই অন্যরকম।

এক সময় ছিল, যখন সে মাথায় করে বাড়ি-বাড়ি নিয়ে গিয়ে খদ্দর বেচত। এই শাওজীর বাড়িব পাঁচিলের বাইরে খানকয়েক ঘর আছে, সহিস, কোচমান, ড্রাইভারদের থাকবার জন্য। তারই একখানা ঘরে সে তখন থাকে। সবে জেল থেকে বেরিয়েছে। রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের বাড়িটা তখন গভর্ণমেন্টের হাতে। ড্রাইভার সাহেবের

কৃপায় এখানে মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়ে সে বেঁচে যায়। চানাচুর বিক্রি করতে সম্ভ্রমে বাধে। তাই দিনে স্বরাজের গান গেয়ে খদ্দর ফিরি করে বেড়াত, রাতে এসে এই ঘরে থাকত। ওই সময় আমিও কতদিন ওর ঘরে এসে আড্ডা মেরেছি। কত সময় তার জন্য ভাত-তরকারি নিয়ে গিয়েছি টিফিন-কেরিয়ার করে। মনে আছে একটা হাসির কথা। সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করত মাছ আছে কি না। মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনের এপার পর্যন্ত শাওজীর জমি। মাছ থাকলে সে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে গিয়ে বসত ড্রেনের ওপারে, রাস্তার ধারে। বলত যে, শাওজীরা বৈষ্ণব, তাঁদের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। একটু বাড়াবাড়ি না? কে দেখতে আসত সেখানে! তাছাড়া আমি নিজের চোখে সেখানে সহিস-কোচমানকে ইঁদুর পুড়িয়ে খেতে দেখেছি। বললেও, ও নিজের জিদ ছাড়ত না। আরও লক্ষ্য করতাম যে, তার সৎ-অসৎ জ্ঞান শাওজীর বেলায় যেমন সজাগ, অপরের ক্ষেত্রে তেমন ছিল না। এর মূলে বোধহয় ছিল তার গহন মনে লুকানো একটা দোষী দোষী ভাব। তখন বুঝতে পারিনি; একথা অনুমান করেছিলাম বহুকাল পরে, তার নিজের মুখ থেকে একটা অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনে। অন্য প্রসঙ্গে বলা। এরকম অভিজ্ঞতার কথা গোপন রাখবার বয়স তখন পার হয়ে গিয়েছে। হাসি-ঠাট্টার খোরাক জোগান ছাড়া কথাটার তখন আর অন্য কোন মূল্য ছিল না।

বাইরের আস্তাবলের পাশের ঘরে থাকবার সময়, কতই বা বয়স ছিল বিরজুর। মনে হত পৃথিবীর যা কিছু সব তারই জন্য। সূর্য ডোবে তারই জন্য; রাত্রিও শেষ হয় তারই জন্য। তার জন্য দোয়েলটা শিষ দিত ভোরের আলো দেখা দেবার আগে; আর ভোরের আলো দেখা দিলে ঘুঘু পাখি তাকে ডেকে বলত---"বিরজু! ওঠো! ওঠো! ওঠো! বিরজু! ওঠো! ওঠো! ওঠো!" বিরজুকে জাগাতে হবে কেন? সে ত জেগেই রয়েছে। মাঝরাত থেকে সে দড়ির খাটিয়াখানার

উপর এপাশ ওপাশ করছে। কোন আড়াল থেকে লুকিয়ে যে ডাকে পাখিগুলো! সারাদিন কোথায় থাকে, কী করে, জানতে ইচ্ছা করে। মন উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে ডানা মেলে লাজুক পাখিগুলোর সঙ্গে! কত কী হয়ত করে। ঠোঁটের চিরুনি দিয়ে আনমনা হয়ে হয়ত পালক আঁচড়ায়। ডাকে আপন খেয়াল-খুশিতে। কণ্ঠধ্বনি দিয়ে বোধহয় সাথীকে সঙ্কেত দেয় নেপথ্য থেকে। বোধহয় ডাকবার পর সঙ্গীর সাড়া পাবার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে উৎকর্ণ হয়ে। বিশ্বসুদ্ধ সকলেই প্রতীক্ষা করে কারও না কারও—কিছুর না কিছুর—কেউ নীল শাড়ির, কেউ মধুগন্ধের, কেউ চাঁপার কলির পরশের। বিরজুও উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করে একটি কণ্ঠধ্বনির। তার মনের সুর বাঁধা ভোরবেলাকার একটা ধ্বনি-সঙ্কেতের সঙ্গে। দিনের পর দিন। সময় বাঁধা।...ওই যে!...

"কারে-ম্যয়!" কারের মা! কারের মাকে ডাকছেন তিনি। ধ্বনির সুরটা সা-রে-গা-র মত। কথাটা ঠিক ধরা যায় না স্পষ্টভাবে, এত দূর থেকে। আন্দাজে মনে হয় তিনি বলছেন—কারেম্যায়!"

এই প্রত্যাশিত ধ্বনিটা কানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরজু এক, দুই, তিন, চার করে গুনতে আরম্ভ করে। মোটামুটি একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে সময়ের। পাঁচশ পর্যন্ত গুনতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আরও। মহাজনী কারবার করেন শাওজী; তাই সব সময় সাবধান। দুর্গের মত দেখতে বাড়িটা। অন্দরমহলের কামরাগুলোয় ক্ষীণ সূর্য ঢুকতে পান অতি সঙ্কুচিতভাবে, ছাতের কাছের গরাদ আঁটা গবাক্ষগুলোর মধ্যে দিয়ে। বড় হাতিতে চড়ে পথ দিয়ে লোক গেলেও তাদের লুব্ধ দৃষ্টি যাতে বাধা পায়, সেদিকে খেয়াল রেখে পাঁচিলের উচ্চতা ঠিক করা হয়েছে। এই পাঁচিলের গায়েই বিরজুর ঘর। পথের হট্টগোলে ভোরবেলা ছাড়া শাওজীর অন্দরমহলের কল-কাকলি এ ঘরে পৌঁছয় না। মাঝে মাঝে জাঁতা পেষার বা পরব উৎসবের কোরাস গান কানে এলে তার মধ্যে থেকে একটা গলার

স্বরকে আলাদা করে চেনবার চেষ্টা করে সে। শাওজীর বাড়ির মেয়েরা শখ করে পিষতেও তো পারেন আটা। কত কিছু কল্পনা করে নিতে ভাল লাগে। পুত্রবধূ, কন্যা, আশ্রিতা, পালিতা কত আছেন শাওজীর বাড়িতে। এঁদের মধ্যে কার সেই কণ্ঠস্বর, সে কথা সে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না···পাঁচশ গোনা শেষ হয়েছে। বিরজুর বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে এল বুঝি। ওই! খুক্! খুক্! প্রত্যাশিত সঙ্কেত। কাশির শব্দ। ভিজে ভিজে গলা। অতি পরিচিত। অত্যন্ত আপন। একবার গলা খাঁকরি দিয়ে বিরজুও কাশল—খুক্ খুক্। কাশির সঙ্কেতের উত্তরে। বেশী জোর নয়। ড্রাইভার-কোচমানের কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। আবার সে কান পেতে শোনে। পরিচিত কাশির ধ্বনির মধ্যে দিয়ে আবার সাড়া দিলেন তিনি। এমনি করেই উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, যতক্ষণ না ড্রাইভার, সহিস, কোচমান ঘুম থেকে ওঠে।···কখন কখন মনে হয়, কৌতুকময়ী সাড়া না দিয়ে মজা উপভোগ করছেন।·· প্রথম প্রথম ছিল খেলা। পরে কিন্তু জিনিসটা বিরজুর কাছে খেলার চেয়েও অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। কত স্বপ্নজাল বোনা এ নিয়ে। এ-ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন, সে সারারাত কেশেছিল গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভান করে।

জেলে যাবার সার্টিফিকেটওয়ালা লোকের বক্তৃতা দেবার সত্যিকারের ক্ষমতা থাকলে, তখনকার যুগে নেতা হবার আর কোন বাধা ছিল না। 'ভারত-কোহলিয়া'র আশীর্বাদের কথা মনে জাগরুক রেখে অতি সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে নিজের অভীষ্টের দিকে এগিয়ে চলছিল কোয়লজী। বহু নামজাদা বক্তার বক্তৃতা শুনেছি; কিন্তু একেবারে খেলো কথা বলে শ্রোতাদের মন ধরে রাখবার এমন অনায়াস ক্ষমতা, কোয়লজীর মত আমি আর দেখিনি। ভাষণ শুনতে হয় তো কোয়লজীর—এমনি একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল সাধারণ লোকজনের মনে, কিছু দিনের মধ্যে। মনে মনে আমরা তাকে ঈর্ষা

করতাম। ওই সময়ের একদিনের একটা ঘটনা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। রাজধানী থেকে বড় নেতা এসেছেন জিরানিয়াতে। হাঁপানি রোগে তিনি বারমাস ভোগেন ; আর যত সারগর্ভ কথাই বলুন, লোকের মন ধরে রাখবার মত করে বক্তৃতা দিতে পারেন না। তখন মাইকের ব্যবহার এ-অঞ্চলে সবে আরম্ভ হয়েছে। মাইকে বললে হেঁপো রোগীর বক্তৃতাও সিংহ গর্জনের মত শোনাবে, এই রকম একটা কথা ফিস ফিস করে সারা জেলার লোকের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। লোকে লোকারণ্য। রাজধানীর নেতা ভাষণ আরম্ভ করলেন। মাইক দিয়ে উন্নতি হয়েছে বক্তৃতার—তাঁর খুসখুসে কাশি ও হাঁপের টানটার অবিরাম আওয়াজ সিংহ গর্জনের চেয়েও জোরে হচ্ছে।···দেশপূজ্য নেতার 'দর্শন'টাই আসল। বেশ কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়েছে এরই মধ্যে। সকলেই পালাতে চায়। 'শান্তি! শান্তি!' "বসে যান ভাই সব!" "প্যারে ভাইয়ো! বহনো!" কিছুতেই কিছু হল না। চোখে জল আসবার জোগাড় জেলার নেতাদের। রাজধানীর নেতা গ্লাস থেকে জল খেয়ে চশমার কাচ মুছতে আরম্ভ করেছেন। স্থানীয় নেতারা রাজধানীর নেতার কাছে কোয়লজীর জনপ্রিয়তার কথাটা না জানতে পারলেই খুশি হতেন। কিন্তু সে উপায় যে নাই। ইঙ্গিত পেয়ে কোয়লজী উঠে দাঁড়াল। মাইকের লোকটা যন্ত্রটা তার কাছে আনতেই, হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল সেটাকে—সে হেঁপো রোগী নয়—সবচেয়ে দূরের শ্রোতাদের শোনাবার মত গলার জোর তার আছে।

কোয়লজী হাত উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। "ছি! ছি! ছি! ছি! ছি!"···আরে! কোয়লজী যে! কী যেন বলবে! কী মজার মজার কথা যে বলে কোয়লজী! ছি-ছি বলবার পর কোয়লজী মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে, শুধু চাহনির মাধ্যমে ওই তীব্র ভর্ৎসনাটা ছড়িয়ে দিল, চতুর্দিকের শ্রোতাদের মধ্যে। বাড়িমুখো লোকরা থমকে দাঁড়িয়েছে। সে বক্তৃতা আরম্ভ করে।···সে একবার গিয়েছিল

কলকাত্তাতে ; কলকাত্তার মছুয়াবাজারে ; হ্যাঁ মছুয়াবাজার স্ট্রীটে। কলকাত্তার মত শহরের মাছের বাজার! সে যে কী চেঁচামেচি, কী হৈ হল্লা! তার আন্দাজ পেতে হলে আসতে হয় আপনাদের কাছে।

শ্রোতারা হেসে উঠেছে। এখনই হয়েছে কী ; দেখ না, হাসিয়ে হাসিয়ে মারবে। তারপর একটু গরমাতে দে ; দেখবি আগুন ছিটবে।

শ্রোতাদের হাসির দমক থামলে কোয়লজী আবার আরম্ভ করে।... কলকাত্তায় ছিলেন চিৎরঞ্জন দাস বালিস্টর। আর এখানে? এখানে আছেন এই চিৎরঞ্জক।...নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে কোয়লজী হাসছেন। সভার লোকেরা হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। তারপর কোয়লজী শ্রোতাদের স্থির হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসতে বলেন। যাঁর মুখ থেকে হেলায় ছিটিয়ে দেওয়া কথাগুলো কুড়িয়ে দেশের খবরের কাগজগুলো বড়লোক হয়ে গেল, সেই মহামান্য নেতার ভাষণ এইবার আরম্ভ হবে ; চুপ করে শুনুন আপনারা! শুনে পুণ্য সঞ্চয় করুন! তাঁর ভাষণ শেষ হবার পর, এই অধম তার টুটা-ফুটা ভাষায় আপনাদের মনের মত দু-চার কথা শোনাবে।...সেদিন মন্ত্রের মত কাজ করেছিল বিশৃঙ্খল জনতার উপর কোয়লজীর এই অনুরোধ।

লেখাপড়া শেখেনি। জনতার হৃদয়ে পৌঁছবার মত এই বলবার ক্ষমতাটুকুই ছিল তার রাজনীতিক কর্মের পুঁজি। কথা বলবার ক্ষমতা চলে যেতেই জেলার নেতারা তাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই অপরিহার্য নয়। রাজধানীতে চিকিৎসাধীন থাকবার সময় সেখানকার পার্টির অফিসের লাউড-স্পীকার-এর চার্জে যে ভদ্রলোক আছেন, তাঁর সঙ্গে একই ঘরে বহুদিন থাকতে হয় কোয়লজীকে। সেই সূত্রেই এই নতুন জীবিকার সঙ্গে তার পরিচয়। নাইবা দিতে পারল বক্তৃতা ; মাইক, লাউডস্পীকার ফিট করবার সূত্রে সভাসমিতির সঙ্গে যোগাযোগ তবু থাকবে।

বিয়ে করেনি। সংসার খরচ ছিল কম। বেশী উপার্জনের চেষ্টা ছিল না। দোকানের আয় থেকেই চলে যেত কোন রকমে। আর সুবিধার মধ্যে, কিছুকাল পরে বিকৃত স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলবার ক্ষমতা সে ফিরে পেয়েছিল।

মিশিরজী রামায়ণের কোন জায়গায় পৌঁছেছেন, এখন সেটা পর্যন্ত ধরতে পারছি না। এত অমনোযোগী হয়ে রয়েছি আমি। মন পড়ে রয়েছে কোয়লজীর দিকে। সে বসে রয়েছে অ্যামপ্লিফায়ার-এর বাক্সর কাছে। পাশের ছাত্রের দল সরবে ঘোষণা করে দিল যে, তাদের তেষ্টা পেয়েছে। পানীয় জল সরবরাহের কর্তব্য সম্বন্ধে গৃহকর্তাকে অবহিত করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের চিৎকারে মিশিরজীর একাগ্রতা ক্ষণিকের জন্য ভঙ্গ হয়েছে। তাঁর চোখের পাতা খুলেছে। গান কিন্তু বন্ধ করেননি মুহূর্তের জন্যও। সভামণ্ডপের গরম সত্যিই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এই ভিড়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে চলে যাওয়াও শক্ত। আমার নজর পড়ে রয়েছে কোয়লজীর দিকে। ওর একটা হাত অ্যামপ্লিফায়ারের স্বরনিয়ন্ত্রণের বোতামের উপর; আর-একটা হাত রাখল মাইকের থেকে আসা তারটা যেখানটায় জুড়ে দেওয়া হয়, সেইখানটাতে। অ্যাঁ! ও কি করল! কোয়লজী নিজে? ঠিকই তাই। মাইক অকেজো হয়ে গিয়েছে। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না। তার খুলে নেবার মুহূর্তে কোয়লজী বাঁহাতে 'ভল্যুম'-এর বোতামটাও টিপে দিয়েছে, নইলে মাইকের গুনগুনানি শব্দটা শ্রোতারা শুনতে পেত। সভামণ্ডপে হইচই আরম্ভ হয়ে গেল। পাশের ছাত্রেরদল ইতর ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে কোয়লজীকে। মিশিরজীর চোখে পর্যন্ত বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। আর কেউ দেখেনি, আমি যা দেখেছি। কেউ সে সন্দেহও করতে পারে না। তবু সকলে বিলক্ষণ চটেছে কোয়লজীর উপর। ব্যস্ত হয়ে কোয়লজী চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথায় যন্ত্রটা খারাপ হয়েছে দেখবার জন্য। আমি জানি ও দেখছে

না, দেখবার ভান করছে। কেন ও অমন করল? ...পিছনের দরজা দিয়ে ও কে ঢুকলেন সভামণ্ডপে? বেদীর দিকে এগিয়ে আসছেন দুইজন বৃদ্ধা বিধবা। গৃহকর্তার মা, আর একজন বোধহয় বাড়ির দাই; আশপাশের লোকের গুঞ্জনধ্বনিতে বোঝা গেল। দাই-এর হাতে দুখান রঙিন রেশমের কাপড়। চেয়ারে আসীন রাম-সীতাকে প্রণাম করলেন গৃহকর্তার মা। তারপর কাপড়ের ভাঁজ খুলে রাম-সীতার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। যতক্ষণ না বৃদ্ধা দুইজন বেদীর পিছন দিককার দরজা দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকে গেলেন, ততক্ষণ শ্রোতাদের একাগ্র দৃষ্টি তাঁদের দিকে ছিল। বার বার মাইক খারাপ হচ্ছে দেখে বোধহয় বাড়ির লোকেরা আগে থেকে এই পর্বটা ঠিক করে রেখেছিলেন, যাতে মাইক মেরামতের সময় শ্রোতাদের নজর এই দিকে থাকে। না, তা ত নয়। গৃহকর্তা নিজে হন হন করে এসে বেদীর উপরে উঠলেন। মিশিরজীকে নমস্কার করে কী যেন বলছেন ফিসফিস করে। তবে কি আজকের পালা এখানেই শেষ? মুখের ব্যঞ্জনায় বোঝা গেল মিশিরজীর আপত্তি নেই গৃহকর্তার প্রস্তাবে। গৃহকর্তা কী যেন বললেন গানের দলের লোকজনকে। তারা সবাই তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সকলে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। তারা গেল নাচ-গানের জন্য সাজগোজ করতে। মাইকের ভাবগতিক দেখে বাড়ির কর্তা আর আস্থা রাখতে পারছে না কোয়লজীর আশ্বাসে। অর্থদণ্ড, কাজ পণ্ড, লোকের কাছে মান-ইজ্জত নষ্ট —বিরক্ত হবারই তাঁদের কথা। পয়সার অভাব তাঁদের নাই। এমন জানলে অন্য জায়গা থেকে মাইক আনতে পারতেন! শ্রোতারা ক্ষেপে উঠেছে। নানারকম কড়া মন্তব্য কানে আসছে, কোয়লজীর বিরুদ্ধে। কোয়লজীর নিজের কিন্তু সেসব কথা কানে যাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে না অসীম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে সে গিয়ে দাঁড়াল বেদীর উপরে মাইকের সম্মুখে। মাথার এক ঝাঁকিতে, বাবরি চুলের বোঝা ছড়িয়ে নিল কাঁধের উপর।

কেশর ফুলিয়ে পশুরাজ নীচের নগণ্য মানুষগুলোকে দেখছে। বক্তৃতার মঞ্চের সম্মুখে এত লোকজন দেখে কি পুরনো কথা মনে পড়ছে তার ? ক্ষুব্ধ,বিশৃঙ্খল শ্রোতার দলকে দেখে বিচলিত হবার পাত্র কোয়লজী নয়। তার হাতের তেলোর একতাল কাদা বলে ভাবত সে শ্রোতাদের এক সময়।

"হেল্লো! হ্বান! টো! থিরি!"

গাঁক গাঁক করে আওয়াজ বার হচ্ছে বিকট জোরে মাইক থেকে। একজন মিস্ত্রি ছুটে যাচ্ছে অ্যামপ্লিফায়ারের দিকে, বোধ-হয় আওয়াজটাকে একটু আস্তে করে দেবার জন্য। গলার স্বরের বিকৃতি মাইকে শতগুণ বর্ধিত হয়ে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ কাঁপিয়ে তুলেছে। গৃহকর্তা কোয়লজীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। থামতে বলছেন তাকে।...যথেষ্ট হয়েছে। আর আমাদের মাইকে কাজ নেই। এখন নাচ-গানের পালা; তাতে মাইক লাগবে না। আপনি দয়া করে আপনার যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিয়ে যান!...কোয়লজী গৃহকর্তার কথা শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না!

"সেবুন! এট্! নাইন! টেন! ইলেবুন!"

থামবার কোন লক্ষণ নেই। কতদূর পর্যন্ত গুনবে কে জানে! অকারণে চিৎকার করে চলেছে। আমার বুক ঢুর ঢুর করছে—এই বক্তৃতা আরম্ভ করে বুঝি কলকাত্তার মছুয়াবাজারের। বাড়ির কর্তা তার কাঁধে হাত দিয়েছেন, কোয়লজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। এইজন্যই বুঝি সে হঠাৎ সংখ্যা গোনা বন্ধ করল। একবার গলা খাঁকরি দিয়ে, সে মাইকের সম্মুখে কাশল—খুক খুক করে। কর্কশ আওয়াজটা বুলেটের মত গিয়ে লাগল অগণিত ধৈর্যচ্যুত শ্রোতাদের কানের পর্দায়। অনেকক্ষণ ধরে তারা এই অকর্মণ্য মাইকওয়ালাটার অত্যাচার সহ্য করেছে। আর নয়। তারা রেহাই পেতে চায় এর হাত থেকে। পাশের ছাত্রের দলকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তারা বুঝে গিয়েছে নিঃসন্দেহে যে, মুখের কথায় কোন ফল হবে না এখানে। ব্যাপারটা ভালভাবে

বুঝে ওঠবার আগেই দেখি তারা হৈ হৈ করে মারমুখি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বেদীর সম্মুখে। তাদের সমর্থনে আরও বহু লোক এগিয়ে আসছে মাইকের দিকে। আমিও ছুটে গিয়েছি কোয়লজীকে বাঁচাবার জন্য। বৃদ্ধ মিশিরজি কোয়লজীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে এই সব অবুঝ পাগলদের বোঝাচ্ছেন। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে আছি। ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে কোয়লজীকে বাঁচাবার জন্য গৃহকর্তা ঠেলে আমাদের পিছনের দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা ঢুকতেই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন, যাতে আর কেউ না ঢুকতে পারে। দরজার পাশে রাখা অ্যামপ্লিফায়ারটাকে আছাড় দিয়ে ভাঙবার শব্দ শোনা গেল। আমরা যেখানে ঢুকলাম, সেটা একটা ঘর। অজস্র হুঁকো, কলকে, গড়গড়া, আর তামাক খাওয়ার অন্যান্য সব রকমের সরঞ্জাম ঘরময় ছড়ান। গৃহকর্তার মা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। রাম-সীতাকে কাপড় পরিয়ে এসে, বোধহয় তাড়াতাড়িতে বসবার সময় পাননি তখনও; কলকে ধরাবার পরেই বোধহয় মাইক-বিভ্রাট ঘটে। বুড়ী দাইটাও ঘরের এক কোণাতে আর-একটা কলকে সাজছে। আমরা ঘরে ঢুকবার মুহূর্তেই বোধহয় গৃহকর্তার মা হুঁকোয় টান দিয়েছিলেন। নাক দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বার হচ্ছে। কাশি আসছে বুঝি ভদ্রমহিলার। চেষ্টা করেও চাপতে পারলেন না। খুক খুক করে কাশলেন। ভক ভক করে ধোঁয়া বার হল মুখ দিয়ে। হঠাৎ আমাদের ঢুকতে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা। এতক্ষণে মাথার কাপড় টেনে দেবার কথা মনে পড়ল তাঁর।

কোয়লজীকে তখনও আমি ধরে। কেমন যেন আড়ষ্ট গোছের হয়ে সে বসে পড়ল সেখানে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে, অথচ যেন কিছু দেখছে না। দরজার বাইরের চেঁচামেচি তখনও শোনা যাচ্ছে—"ভিয়েনার বাচ্চা কোথাকার! একবার আয় দরজার বাইরে—তোকে আজ মাইকে চড়াবো! ভেবেছিস কি!"

কোয়লজীর হাঁটুর কাছের অসাড় ভাবটা কাটলে, গৃহকর্তা খিড়কির দুয়ার দিয়ে আমাদের বার হবার পথ দেখিয়ে দিলেন। সভামণ্ডপের হইচই তখনও থামেনি। নিঃশব্দে চোরের মত চলেছি আমরা পথ দিয়ে। কিজন্য সে নিজেই মাইকটা খারাপ করে দিয়েছিল, এই প্রশ্নটা এখনই তাকে করা উচিত হবে কিনা ভাবছি; এমন সময় সে নিজেই কথা বলল ফিস ফিস করে।

"সেই আওয়াজটা তামাক টানবার কাশির; এঁরই।"

সাঁঝের শীতল

"পালা বলছি এখান থেকে! শয়তান কোথাকার!" কাস্তে তুলেছে শীতল কুকুরটাকে ভয় দেখানর জন্য।...'বাবু-ভাইয়াদের' বাড়ির হাতায় ছাড়া, কাস্তে দিয়ে কাটবার বড় ঘাস পাওয়া যায় না। আজেবাজে লোকের গরু-ছাগলে খেয়ে যায় খোলা মাঠের ঘাস।...... যারা বেঁধে গরুকে ঘাস খাওয়ায় না, গরু বাঁধে শুধু দুধ দুইবার সময়—দেখতে পারে না শীতল দু চক্ষে ওই সব 'থাড়-কেলাসী' লোকদের!...বাবু ভাইয়ারা আবার খুরপি দিয়ে ঘাস ছিলতে দেয় না হাতার মধ্যে; বলে ধূলো উড়বে। নে বাবা, ভগবান তোদের দুহাত ভরে দিয়েছে--যা বলিস তাই সাজে! জমি থেকে ধূলো উড়বে না তো কি আটা ময়দা উড়বে? কত রকমের লোক যে আছে দুনিয়াতে! হাতার ঘাসে খুরপি চালাতে না দিলেই কি আর ভদ্রলোক হওয়া যায়। অন্যের কাটা ঘাসের অর্ধেক যারা চায়, তারা আবার ভদ্রলোক কিসের!...তবে তার নিজের কথা আলাদা। তার কাছ থেকে ঘাসের অর্ধেক আজ পর্যন্ত কোন বাবুভাইয়া চায়নি।...একবার কাটা ঘাসের ভাগ চেয়ে যেন দেখে তার কাছে! তা ছাড়া সে নিজের অভিজ্ঞতায় জানে যে, কেউ তাকে চটাতে চায় না—ভালবাসুক আর না-ই বাসুক...না না, বাবুভাইয়ারা তাকে ভয় করতে যাবে কেন—ভালবাসে। ভাল না বাসলে কেউ কি বাইরের লোককে নিজের হাতার মধ্যে ঢুকতে দেয় রাত দুপুরে? সে তো চিরকাল ঘাস কাটে রাত্রিতে—ভাটিখানা থেকে ঘুরে আসার পর। তাই না লোকে বলে যে সে জন্তুজানোয়ারদের মত, দিনের চেয়ে রাত্রির অন্ধকারে ভাল দেখতে পায়।...ভুলে কাস্তেটা ফেলে এলে বাবুভাইয়ারা পরের দিন ডেকে ফেরত দেয়!...ভাল না বাসলে কি আর উকিলসাহেব পরশু

দিন ও কথা বলতেন। তিনি বলেছিলেন, "বর্ষার জঙ্গলে রাত্রিতে ঘাস কাটিস শীতল,—কোনদিন সাপের কামড়ে মরবি।" আরে সাপও জঙ্গল থেকে এসেছে, মানুষও জঙ্গল থেকে এসেছে।...

কুকুরটা তার সঙ্গে খুনসুড়ি আরম্ভ করেছে। সে ছোট ছোট বোঝা করে যে ঘাস কেটে রাখছে, কুকুরটা সেগুলোকে ছিটিয়ে ফেলছে, তার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে।

"খেলা পেয়েছিস—না? পালা বলছি! শুনছিস না তবু! দাঁড়া, ধরে তোর হাড়-গোড় ভাঙ্গছি!"

ধরতে গেলে কুকুরটা পালায় না। চিত হয়ে পা চারখানা আকাশের দিকে তুলে দেয়। একটু আদর চায়। ছোট ছেলে-পিলেদের যেমন করে 'আশ-মোড়া পাশ-মোড়া' দেয়, তেমনি করে শীতল, কোণাকুনি দুটো করে পা এক একসঙ্গে দুমড়ে ধরছে কুকুরটাকে।

—"এবার কেমন জব্দ! আর করবি? আবার হাসা হচ্ছে—বদমাশ কোথাকার!"

নিশ্চয়ই সে কুকুরের হাসি চেনে? কুকুররাও যে তাকে নিজেদেরই একজন বলে ভাবে তাতে ভুল নাই। গায়ের গন্ধ থেকেই হবে বোধহয়। সে পারতপক্ষে স্নান করে না—লোকে বলে নেশার রঙ কেটে যাবার ভয়ে। ময়লা চিরকুট কাপড়খানাকে কাচে না কেন তা' সে-ই জানে। ওই কাপড়ের গন্ধ, গায়ের ঘামের গন্ধ, অষ্টপ্রহরের গাঁজার গন্ধ, আর সাঁজের পরের মদ তাড়ির গন্ধ, সব মিলিয়ে কি যেন একটা আপন আপন জিনিস খুঁজে পায় কুকুরেরা তার মধ্যে।

"আচ্ছা আর এখন না। অনেক হয়েছে। আমার আজকে বড় তাড়াতাড়ি। এখনই জজ সাহেবের বাড়ি যেতে হবে। চুপটি করে শুয়ে থাক।"

কুকুরটাকে দুটো চাপড় মেরে সে আবার ঘাস কাটতে বসে।

"জিমি! জিমি!"

উকিলবাবু কুকুরটাকে ডাকছেন বাঁধবার জন্য। কান খাড়া হয়ে উঠেছে জিমির। কম্পাউণ্ডের পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে গেল ধরা না দেবার মতলবে।

শীতলের ঠোঁটের কোণে দুটো রেখা পড়ল—ত্রস্ত চাউনি আর ধূর্ত হাসি থেকে সে মতলব বুঝেছে কুকুরটার। উকিলবাবুর ছেলে হাতে শিকল নিয়ে জিমির খোঁজে সেখানে এসে দেখে যে, শীতল গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে ঘাস কাটছে।

"আজ এখন যে?"

রাতে মদের দোকান থেকে ফেরবার পর আরম্ভ হয় তার ঘাস কাটা। সারারাত মাঝে মাঝে ঘুমোয়, মাঝে মাঝে গাঁজা খায়, মাঝে মাঝে ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাস কাটে। কিন্তু শীতল আজ এসেছে সকাল বেলায়।

—"জজসাহেবের বাড়িতে এখনই যে ঘাস দিয়ে আসতে হবে আজ।"

জজসাহেব কথাটার উপর দরকারের চেয়েও একটু বেশী জোর দিয়ে বলা।...বাবুভাইয়াদের সঙ্গে সে অনেককাল কাটিয়েছে। দেখেছে তো। কার বাড়ির জন্য ঘাস, সেইটা শোনবার পরই তাঁদের কথার ঝাঁজ মরে আসে। সবাই জজসাহেবের নামে কাবু। উকিল, মোক্তার আমলা সবাই ঝুঁকে সেলাম করে জজসাহেবকে। করবে না? আরে জজসাহেব যে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় হাকিম—কলেক্টর সাহেবের চেয়েও বড়। সেই জজসাহেবের এজলাসের 'পাংখা-পুলার' সে, তার উপর সাহেবের বাড়িতে ঘাস দেয়। তাই না সাহেবের সংসারের খবর, উকিল মোক্তাররা কত সময় তার কাছে জিজ্ঞাসা করে। সেই জন্যই না অন্য 'পাংখা-পুলার'রা হিংসা করে; চাপরাশিরা সমীহ করে কথা বলে। আমলা পর্যন্ত খাতির দেখায়- মেমসাহেবের কাছে গিয়ে শীতল আবার কার নামে কি লাগাবে সেই ভয়ে।

"এত তাড়াতাড়িটা কিসের আজ?"

"ছুটির দরখাস্ত দেবো, মেমসাহেবের কাছে।"

আরদালীরা মুনসেফ, সাবজজের স্ত্রীদের মাইজীই বলে চিরকাল। তাই স্বামী জজসাহেব হবার পর থেকে মেমসাহেব কথাটা বেশ ভাল লাগে জজপত্নীর। মেমসাহেব লোক ভাল। সস্তায় ঘাস দিয়ে সে প্রথম খাতির জমায় মেমসাহেবের সঙ্গে। অবশ্য ড্রাইভার সাহেবের সুপারিশও ছিল। জজগৃহিণী আধপাগলা লোকটাকে মধ্যে মধ্যে খেতে দেন। সাহেবের একটা পুরনো কামিজও শীতকালে দিয়েছিলেন। ছিঁড়ে ঝুলিঝুলি হয়ে গেলেও এই গ্রীষ্মকালেও শীতল ছাড়েনি সেটাকে।

"কালকে তো রবিবার রে।"

"এ কি আর উকিল মোক্তার পেয়েছেন! গভর্ণমেণ্টের চাকরেরা কি বিনা অনুমতিতে রবিবারে সদর থেকে বাইরে যেতে পারে?"

উকিলবাবুর ছেলে হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করে—

"ক' দিনের ছুটি?"

"একদিনের। শুধু সোমবারের।"

"কেন রে?"

"দেশে যাব।"

"মোটে একদিনের জন্য?"

"হ্যাঁ জরুরী কাজ। আজকে শনিবার—আজ যাব আর মঙ্গলবার সকালে ফিরে আসবো।"

"বাড়ি কোথায় রে তোর?"

"শাপুর-পটৌরী। নাম শোনেন নি? এখান থেকে যেতে রেলগাড়িতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।"

"তুই আবার দেশে যাস নাকি? শুনি তো যে তুই আর তোর বন্ধু কখনও দেশে যাস না।"

"ঠেলায় পড়লে শীতলের বাপকে পর্যন্ত যেতে হয়—এ তো শীতল! আমার কথা বাদ দেন, কিন্তু ও লক্ষ্মীছাড়াটার যে বউ আছে, মেয়ে আছে তবু যায় না।"

এত এখানকার জীবন-পরিবেশের সঙ্গে এই বিচিত্র লোকটি জড়ানো যে, শীতলের যে আবার অন্য কোথাও একটা দেশ থাকতে পারে, একথা এখানকার লোকে ভুলে গিয়েছে। শুধু ওর বন্ধুর মারফত লোকে এক সময় শুনেছিল যে ছেলেবেলায় শীতল কুমোরের কাজ করত, তারপর ওর বউ ওকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন থেকে আর বড় একটা দেশে যায় না সে।

"তোর কপালে ওটা কিসের দাগরে ? পড়ে-টড়ে গিয়েছিলি ?"

শীতল হাসল।

"ইয়ার-দোস্তের হাসিঠাট্টায় চোট লেগে গিয়েছে।"

"তোর ইয়ার-দোস্ত বলতে তো জজসাহেবের ড্রাইভার নথুনী।"

"হ্যাঁ, সেই শালাটার কথাই বলছি !"

একটু এগিয়ে গিয়ে সে থাবড়ি খেয়ে বসল নতুন জায়গার ঘাস কাটতে। জানিয়ে দিল যে, সে ও প্রসঙ্গের আলোচনা করতে চায় না উকিলবাবুর ছেলের সঙ্গে।

শীতলের পায়ের দিকটা ঠিক স্বাভাবিক আকৃতির না। এক পা ছড়িয়ে আর এক পা দুমড়ে থাবড়ি খেয়ে না বসলে সে ঘাস কাটতে পারে না।

উকিলবাবুর ছেলে একটু অবাক হয়, তাকে নথুনীর সম্বন্ধে ওরকম ভাষায় কথা বলতে দেখে। বয়সে ছোট হলেও নথুনীই শীতলের একমাত্র বন্ধু। একজনকে না হলে আর একজনের চলে না ; সকলে বলে মাণিকজোড়। নথুনীর পদ মর্যাদা বাড়াবার জন্য অন্য লোকের সম্মুখে শীতল তাকে ড্রাইভার সাহেব বলে ডাকে।...রাত্রিতে ঝগড়া হয়েছে বোধহয় দুইজনার মধ্যে।...

"জিমি ! জিমি !"

কুকুরের খোঁজে চলে গেল উকিলবাবুর ছেলে।

কাছারিতে ঘড়ি বাজছে ঢং ঢং করে। এক, দুই তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট—শীতল আটবার মাটিতে কাস্তে ঠুকে গোনে। আটটা

বেজে গেল এরই মধ্যে! চোখের উপর হাত রেখে সে সূর্যের দিকে তাকাল একবার। তারপর সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। একটু যেন হাতের ভর দরকার হল ওঠবার সময়। এতক্ষণে দেখা গেল তার সম্পূর্ণ চেহারাটা। কোমরের থেকে নীচের অংশটা উপরের অংশ থেকে অনেক ছোট। হাঁটুর কাছটা একটু বেরিয়ে এসেছে, ধনুকের মত। পায়ের ফাঁক ফাঁক আঙুলগুলোও ভিতরের দিকে বাঁকানো—পা ফেলবার সময় বুড়ো আঙুলের ডগা দুটো যেন ঠেকতে চায়। বসা অবস্থায় তাকে বেঁটে বলে মনে হয় না; কিন্তু দাঁড়ালেই বোঝা যায় যে সে বেঁটে। পায়ের দিককার দুর্বলতা পুষিয়ে দিয়েছে, উলকিতে ভরা শরীরের উপর দিকটা। এতখানি চওড়া বুকের পাটা। কাঁধের আর হাতের পেশীগুলো ঢেউখেলানো ইস্পাতের মত। একরাশ রুক্ষ বাবরি চুলে ভরা মাথাটা সিংহের মাথার মত দেখায়। আর তাকানো মাত্র বোঝা যায় যে অসীম শক্তি লোকটার গায়ে; এক ফালি কাস্তের বদলে যেন এর হাতে একটা গদা থাকলে মানানসই হত; মাথায় ঘাসের বোঝার বদলে গন্ধমাদন পর্বত। সাধে কি আর পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলে ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলে।

শীতল ঘাসের বোঝা নিয়ে হেলতে দুলতে চলেছে। পিছনে দুটো কুকুর। আরও একটা কুকুর ছুটে এল গন্ধ পেয়ে। লেজ নাড়তে নাড়তে গা শুঁকছে তার।

"কি রে বদমাস! কাছারি? উকিল বালিস্‌টার হবার শখ বুঝি?"

শীতলকে দেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে পালাচ্ছে যে যেদিকে পারে। একজন বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।...দেখে দুঃখ হয় আবার হাসিও আসে।

"শীতল! ও শীতল!"

একটি বড় ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে।

"শীতল, এটা আমাদের আমগাছতলার শুকনো পাতার নীচে থেকে পেয়েছি।"

হাতে একখানা মরচেপড়া কাস্তে। কাঠের বাঁটের প্রায় সমস্তটাই উই-এ খেয়ে গিয়েছে। ছেলেটা জানে যে এ কাস্তে শীতলের না হয়ে যায় না। কত কাস্তে যে ওর কত জায়গায় গোঁজা আছে তার ঠিক নাই। রাতদুপুরে ঘাস কাটবার পর বেশ গুছিয়ে লুকিয়ে রাখে। নেশা কাটবার পর পরের দিন সকালে আর মনে থাকে না। তখনই হয় বিপদ। অস্থির হয়ে এ-বাড়ি সে-বাড়ি খুঁজে বেড়ায়—আর অনর্গল অজ্ঞাত চোরের উদ্দেশে গালি পাড়ে। তারপর কি করে যেন নতুন কাস্তে কিনবার পয়সাও জুটিয়ে নেয়। নেশা আর কাস্তের জন্য পয়সা চুরি-চামারি যেমন করেই হক, তাকে জুটিয়ে নিতেই হয়।

একগাল হেসে সে ছেলেটির হাত থেকে কাস্তের ফলাটা নেয়। কটা-কটা দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে হলদে হলদে দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে। বনমানুষের মত মুখখানা আরও কুৎসিত হয়ে উঠেছে কপালের দাগটার জন্য।

"পাকা ইস্পাত এটা। জজসাহেবের হাওয়াগাড়ীর স্প্রিং থেকে তয়ের করিয়েছিলাম এটাকে। খোকাবাবু তুই বড় হলে জজসাহেব হ'স, বুঝলি!"

"জজসাহেবের ড্রাইভার নিশ্চয়ই তোকে গাড়ির স্প্রিংটা দিয়েছিল।"

গম্ভীর হয়ে গেল শীতল। মরচেধরা কাস্তেখানাকে দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে সে আবার চলতে আরম্ভ করে।···যাক, এখান পেয়ে ভালই হ'ল! তার যে আজ পয়সার দরকার। কাল পরশু যে রোজগার বন্ধ থাকবে।···রেলের টিকিট অবশ্য সে কখনও কেনেনি আজ পর্যন্ত। আর ছোট কলকেতে টান মারতে দেবার লোক এক আধটা জুটেই যায়, রেলগাড়িতে।···তবু ভালই হ'ল বলতে হবে!···

পাশের বাড়ির জানলায় দিদি ভয় দেখাচ্ছে দুষ্টু ভাইকে।

"চুপ কর বলছি! দেবো ধরিয়ে শীতলের কাছে! শীতল ধরে নিয়ে যা তো খোকাকে, ঘাসের বোঝার মধ্যে ভরে! তখন থেকে কাঁদছে।"

হলদে দাঁতগুলো বার করে শীতল এগিয়ে এল জানলার দিকে।

"কি খোকা—কাছারিতে যাবি আমার সঙ্গে? পান খাওয়াব তোকে সেখানে, পানের দোকানে।"

যেন মেলা দেখাতে নিয়ে যাবার লোভ দেখাচ্ছে। এই হচ্ছে শীতলের আন্তরিক আদরের ভাষা। কোন ছেলেপিলে আজ পর্যন্ত তার এই আদরের ডাকে সাড়া দেয়নি। শুধু পাড়ার কুকুরগুলো তার দৌলতে আদালতের কম্পাউণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

তার আদরের ঘটায় দিদির কোলে খোকার কান্না বেড়ে গেল।

"আরে বোকা খোকাবাবু—তোকে উকিল হতে হবে না- তোকে জজসাহেব করে দেবো—কাঁদিস না।"

শীতল তাড়াতাড়ি হাঁটছে। আর বেশী সময় নাই।

"কি রে শীতল! তোর কপালে ওটা কিসের দাগ রে? দূর থেকে প্রথমে ভাবলাম বুঝি আবার কপালেও নতুন করে উলকির ছবি আঁকলি।"

...আবার চেনা লোক! এখানে সবাই তার চেনা।...আজ তাড়াতাড়ি কি না, তাই আজ সবার দরদ উথলে উঠেছে!...কপালের এই দাগটার সঙ্গেই যে তার এখন তাড়াতাড়ি হাঁটবার সম্বন্ধ।... কাজের পথে কত বাধা।...

"সেই হতভাগাটার কাণ্ড।"

"কার?"

"কার আবার। যেন বুঝতেই পারছিস না। ওই বজ্জাত নথুনীটার।"

লোকটা অবাক হ'ল নথুনীকে ড্রাইভার সাহেব না বলায়।

"হনহনিয়ে চললি যে। দাঁড়া, দাঁড়া! চিলম ধরাই। এক দণ্ড দাঁড়িয়ে চিলমে দুটো টান মেরে গেলে তোর রাজকাজের কোন ক্ষতি হবে না। চাকরি তোর এমনিও যাবে, অমনিও যাবে। আর ক'টা দিন?"

শহরে নতুন ইলেকট্রিসিটি এসেছে। আদালতঘরে টানাপাখার বদলে 'ইলেকট্রিক ফ্যান'এর ব্যবস্থা হচ্ছে। তারই উল্লেখ।

"আরে চাকরি আমি থোড়াই পরোয়া করি! বেঁচে থাকুক আমার ঘাসকাটা; বেঁচে থাকুক আমার বাবুভাইয়ারা। বছরের মধ্যে পাঁচ মাসের তো চাকরি। বাকি সময় যে পেশকার সাহেবের বাড়িতে এক বেলা খেতে দেয়, সেও এই ঘাস দেবারই খাতিরে। বুঝলি? কাল এই কথা থেকেই তো নথুনীটার সঙ্গে কথাকাটাকাটির আরম্ভ।"

...লোকটা যখন কোমর থেকে কলকেটা বার করেছে, তখন আর চলে যাওয়া ভাল দেখায় না। আলাপ-পরিচয়, ভাব-ভালবাসা বলেও তো একটা জিনিস আছে!...

"ঝগড়া হয়েছে নাকি কাল তোর বন্ধুর সঙ্গে? তোদের ভাবও বুঝি না, আড়িও বুঝি না। ও তোদের লেগেই আছে। সেবার তো তোদের তিন মাস মুখ দেখাদেখি ছিল না।"

মুখখানা একটু কাঁচুমাচু হয়ে গেল শীতলের। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ের অতীত লোকটা শুধু এই প্রসঙ্গটা উঠলেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আগের জজসাহেবের বন্ধুরা একবার বেড়াতে এসেছিলেন এখানে। গাড়ির মধ্যে তাঁরা একখানা কম্বল ফেলে গিয়েছিলেন। পরের দিন খোঁজ পড়ে। নথুনী জজসাহেবের বকুনি আর জেরায় বলে দিয়েছিল যে সেটা সম্ভবত শীতল চুরি করেছে। দুই বন্ধুতে মিলে কম্বলখানাকে বেচে নেশার খরচ জুগিয়েছিল এ কথাটা সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছিল। এই থেকে দুই বন্ধুতে সেবার মাস তিনেকের ছাড়াছাড়ি হয়।

সন্ধ্যার মুখে এ রকম ছোটখাটো চুরির নজির শীতলের বিরুদ্ধে আরও আছে। কেউ খোঁটা দিলে সে সেসব অভিযোগ জোর গলায় অস্বীকার করে না। হলদে দাঁতগুলো বার করে জবাব দেয় যে, ঠিক সন্ধ্যার মুখে করা কাজের জন্য দায়ী শীতল দাস নয়—বোতল দাস।

"বেশী বাজে বকিস না, বুঝলি।"

ছোট কলকের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে, অতটা মনের জোর

সকাল বেলার শীতল দাসেরও নাই। দাঁড়ালে কথা বলতেই হয়। কথায় কথা বাড়ে। ছোট চিলমের পরিবেশে প্রাণের কথা বেরিয়ে আসে। কার কথা আবার—এই লক্ষ্মী-ছাড়া নথুনীটার। কাল রাত্রিতে সেটাও এই চাকরির কথাই তুলেছিল। বলেছিল, "শীতল, এতকাল তো পাখা টেনে জজ উকিল ব্যারিস্টারকে হাওয়া খাওয়ালি — এবার থেকে নিজে হাওয়া খেয়েই থাকিস।"

রাত্রিবেলায় মদের দোকান থেকে ফেরবার পর তারা বসেছিল জজসাহেবের বাংলোর 'আউট হাউস'-এর সম্মুখে। বলেছিল হাসি-ঠাট্টার সুরেই।

শীতল পাল্টা জবাব দিয়েছিল—"এর পরের কোন জজসাহেব যদি হাওয়াগাড়ির বদলে হাওয়াই-জাহাজ রাখে, তা হলে তোরও কি দশা হয় দেখিস না।"

"যাই হোক, তোর মত ঘাস কেটে খেতে হবে না।"

কে যে কখন কোন্ মেজাজে থাকে। শুনেই মেজাজ বিগড়ে গেল শীতলের।

"হবে। আলবৎ হবে! এই আমি বলে রাখলাম হবে! আমার ঘাসকাটা নিয়ে তুই ঠাট্টা করিস? জজসাহেবের হাওয়াগাড়ির চাকার ময়লা ধুতে পাস বলে? শঙ্করজী মহাদেব উপর থেকে সব দেখছেন। আমার এতকালকার তেল না মাখবার যদি কোন পুণ্য হয়ে থাকে, তা হলে বলে দিচ্ছি যে, তোরও চাকরি থাকবে না। বিনা মাইনের ড্রাইভারীর চাকরিও থাকবে না—মোহাফেজখানার 'পঞ্চি'র জালিয়াতি চাকরিটাও থাকবে না। বাবারও বাবা আছে। জজসাহেবের উপরও লোক আছে। আমি নিজে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে হাইকোর্টে দরখাস্ত দেবো, তোর জালিয়াতির বিরুদ্ধে!"...

মোহাফেজখানার চাকরির ব্যাপারটা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত; কিন্তু আদালতের সবাই জানে। 'রেকর্ড-রুম'এর 'পাঞ্চিং ক্লার্ক' নামের একটা পদে কাগজ-কলমে নথুনী চাকরি করে।

সে মাইনে পায় গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ওই কাজের জন্য, যদিও সে রেকর্ড-অফিসে কোনদিন যায়নি। আর যে কোন জজসাহেব আসুন, নথুনী বিনা মাইনেতে তাঁর মোটরগাড়ি চালায়। জজসাহেবদেরও পয়সার সাশ্রয়; আর আমলারাও এই ব্যবস্থায় জজসাহেবকে খুশী করতে পেরে নিজেদের নির্বিঘ্ন মনে করে। কত জজ এলেন, গেলেন কেউ এ ব্যবস্থায় আপত্তি করেননি। তস্মিন তুষ্টে, আদালতের বিচিত্র জগৎও তুষ্ট।

এই 'পাঞ্চিং ক্লার্ক'এর কাজেরই উল্লেখ করেছিল শীতল বন্ধুকে চাকরি খাওয়ার হুমকি দেখিয়ে।

শুনে নথুনীর মাথা গরম হয়ে ওঠে।

"তুই আমার বাপ তুলে কথা বলিস!"

আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে শীতল। শরীরের উপর দিকটা ভারী, পায়ের দিকটা দুর্বল; তাই ধাক্কার টাল সামলাতে পারেনি সে। চোট বেশী কিছু লাগেনি। শুধু কপালটা ঠুকে গিয়েছিল, এক টুকরো ইটের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে বোতল দাস শীতল দাসে ফিরে এসেছিল।

এই গরমাগরমির বাজারেও শীতল রাগ করতে ভুলে গেল। অবাক হয়ে যায় সে রোগাপটকা নথুনীর দুঃসাহস দেখে। হ'ল কি লোকটার? এত মাথা গরম! এ তো ভাল লক্ষণ নয়। নেশা-হওয়া লোককে সে দূর থেকে দেখে চিনতে পারে। নথুনীটার নেশা তো লাগেনি। তবে? রগচটাও তো নয় সে। তবে?...একটু উড়ু উড়ু ভাব সে লক্ষ্য করছে কিছুদিন থেকে তার বন্ধুর ভিতর। ওই মেথরের ঘরের সম্মুখের কাঁঠাল গাছটার নীচে যখন তখন বসে বসে আড্ডা মারা আরম্ভ করেছে। মেথরের ঘরটা অন্যান্য চাকরবাকরদের ঘর থেকে অনেক দূরে। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকবার দরকার কিসের?... হাজার হলেও ছেলে মানুষ তো!...ঠিকই তাই। এইজন্যই সে এত রগচটা হয়ে যাচ্ছে।...

অদ্ভুত শীতলের যুক্তির ধারা।

"তোর সব বদমাশি আমি বার করছি, দাঁড়া! ভাবিস যে আমি কিছু বুঝি না!"

এই পর্যন্তই ঘটেছিল কাল রাত্রে। তখনই শীতল মত স্থির করে ফেলেছিল।

দুটো মোক্ষম টান মেরে শীতল ছোট কলকেটা দিল লোকটার হাতে।

"আচ্ছা, আর একদিন এসব গল্প হবে। আজ আমার বড় তাড়াতাড়ি। জজসাহেবের বাড়ি যেতে হবে।"

ঘাসের বোঝাটা মাথায় তুলবার সময় লোকটা সাহায্য করতে এলে সে বলে—"না না। শীতল দাস এখনও অত কমজোর হয়নি রে।"

কুকুর তিনটেকে তখনও পিছনে পিছনে আসতে দেখে সে হেসে আকুল।

"পালা! পালা! আমি এখন কাছারি যাচ্ছি না। যাচ্ছি জজসাহেবের বাংলায়। তোরা সেখানে গেলে ব্যস, আর দেখতে হচ্ছে না। দড়াম্! দড়াম্! দেবে জজসাহেব বন্দুক দিয়ে গুলি করে। হ্যাঁ!"

ঘাসের বোঝা উঠনে ফেলে সে মেমসাহেবকে আদাব করল।

"কি রে শীতল?"

"আমার আরজি আছে হুজুরের কাছে।"

তারপর সে হুজুরের কাছে ছুটির আরজি পেশ করে। ঘাস-দেওয়া থেকে ছুটি দুই দিনের, আর এজলাসে পাখা-টানার কাজ থেকে ছুটি একদিনের। বাড়ি যাবে সে। এ দুদিন ড্রাইভার নথুনীকে বললেই সে ঘাস ছিলে এনে দেবে।...আমার দোস্ত সে, আর আমি জানি না তাকে? রোজ আমাকে কত ঘাস ছিলে দেয়।...

"সে না হয় হ'ল, কিন্তু পাখাটানার কাজ থেকে ছুটি দেবার মালিক কি আমি?"

"মেমসাহেব, আপনিই আদালতের সব। সাহেবের স্টেনো যতীনবাবু তো এখন বাইরের বারান্দায় রয়েছেন। তাঁকে আপনি একবার বলে দিলেই হয়ে যাবে।"

সে বাড়ি যাচ্ছে শুনে তাকে মেমসাহেব চার আনা পয়সা দিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচুর জেরা সত্ত্বেও সে বলল না—হঠাৎ বাড়িতে তার কি কাজ পড়ল।

আসবার সময় আদাব করে সলজ্জভাবে হেসে বলে এসেছিল যে, দেশ থেকে ফিরে এসেই তার দেশে যাবার কারণটা মেমসাহেবকে বলে যাবে। আর একবার মনে করিয়ে দিয়েছিল নথুনীকে দিয়ে ঘাস আনাবার কথাটা।

লোকে ভাবে এক, হয় আর। ভেবে গিয়েছিল দুই দিনের মধ্যে ফিরবে; ফিরল এগারো দিন পর, সঙ্গে নিয়ে নথুনীর স্ত্রী আর মেয়েকে। বেশ লাগে প্রথম থেকেই সাত বছরের মেয়েটাকে-তাকে দেখে ভয় পায়নি কি না। নথুনীর বউকে আনতেই সে গিয়েছিল। তারা শাপুর-পটৌরীতে ছিল না। বহুদিন থেকে নথুনী টাকা পাঠায় না, তাই তাদের বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। এইজন্যই শীতলের ফিরতে দেরী হ'ল।

...এই হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া নথুনীর ওষুধ। যতদিন মনে পড়েনি একথা ততদিন যা হয়েছে তা হয়েছে; কিন্তু এখন আর সে সব চলবে না।...

তারা এখানকার স্টেশনে এসে পৌঁছল দুপুর বেলায়। স্টেশন থেকে আদালত মাইল তিনেকের পথ।...অতটুকু মেয়ে এই খাঁ খাঁ রৌদ্রে পারবে কেন অতটা পথ যেতে! কাঁধের উপর মেয়েটাকে তুলে নেয় শীতল। আর এক কাঁধে নথুনীর বউ-এর পুঁটলিটা। যেন মেলা দেখতে চলেছে।

"চল্ না, কাছারিতে তোকে জজসাহেব দেখাব। তোর বাপ আবার কাছারির দোকান থেকে দহিবড়া কিনে খাওয়াবে, ফুলুরি কিনে খাওয়াবে, পান বিড়ি খাওয়াবে। দেখিস না।"

বাপের কথা মনে নাই মেয়েটার। সলজ্জ কৌতূহলের একটা মৃদু হাসি ক্ষিদেয় কাতর মেয়েটার শুকনো মুখে ফুটে উঠল। নতুন নতুন লাগে শীতলের। নথুনীর বউএর কৃতজ্ঞতাভরা চাউনিটাও।

মনে মনে হাসে শীতল। অবাক করে দেবে ড্রাইভার সাহেবকে। তারপরে নথুনীর বউ আর মেয়েটাকে মেমসাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকেও অবাক করে দিতে হবে।...ওই কাছারি! এসে গেল এইবার।

কই? কই?

এই এসে পড়েছি এইবার আমরা। ওই যে গাড়িবারান্দা দেখছিস না? ওইখানেই আছে জজসাহেবের গাড়ি।...চেনা পরিবেশ। লোকজনের অধিকাংশই চেনা। তবু এখন কারও দিকে তাকাবার ফুরসত নাই শীতলের।...কিন্তু এ কি? গাড়িবারান্দার নীচে গাড়ি তো নাই! অসুখ? বাড়ি গিয়েছেন টিফিন খেতে? মহকুমা শহরের আদালত দেখতে যান নাই তো?...কাছারির হইচইও যেন একটু কম কম লাগছে আজ! কেন?

একজন চাপরাশীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছেই শুনতে পেল ব্যাপারটা। আগেকার জজসাহেব বদলি হয়ে গিয়েছেন। নতুন জজসাহেব এসেছেন চার পাঁচদিন হল। বড় কড়া মানুষ।

ফিস ফিস করে বলা। এখানে দাঁড়িয়ে এর চেয়ে বেশী কথা বলবার সাহস কোন চাপরাশীর নাই।

"ড্রাইভারসাহেব কোথায়?"

"আর ড্রাইভারসাহেব! দেখ গিয়ে, মোহাফেজখানায় যদি থাকে তো। ন ঘরকা, ন ঘাটকা। না ড্রাইভার না পঞ্চি-ক্লার্ক।"

নথুনীর সঙ্গে দেখা হতে সে তো চটে আগুন। তার মাথায় এখন সমূহ বিপদ। "নতুন হাকিম সাদা চামড়ার সাহেবের বাবা। নতুন এ লাইনে এসেছে। আগে ছিল এস-ডি-ও না ম্যাজিস্ট্রেট কি যেন। তিরিক্ষি মেজাজ। এরই মধ্যে ডিক্রিজারি মুহুরারকে সাসপেণ্ড

করেছে ; ইংরাজিতে ছাড়া কথা বলে না ; চাপরাশীকে বলে চ্যাপাসী ; পেশকার সাহেবের সঙ্গে পর্যন্ত একটা হিন্দী বলেন নি ; নীলবাঙলার পেরীসাহেব সেরিস্তায় বসে নথি দেখছিল বলে তাকে পুলিসে দিয়েছে ; স্টেনোগ্রাফার যতীনবাবু একটা বানান ভুল করেছিল বলে সে কথাটা পাঁচশবার খাতায় লিখিয়ে তবে ছুটি দিয়েছে ; এইবার বোধ হয় কান ধরে ওঠ-বস করাবে কেরানীদের। সাক্ষীদের এজাহার হাতে লেখে না—টাইপ করে।"

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে শীতলের চোখ।

"বলিস কি! খট্‌ খট্‌ খট্‌ খট্‌? এজলাসের মধ্যে? তাজ্জব কথা! কত জজসাহেব দেখেছি এর আগে। এ একেবারে কলম ধরেই না?"

"না।"

"কলম নাকচ করে দিয়েছে জেলার সবচেয়ে বড় হাকিম?"

নতুন জজসাহেবের উগ্র মেজাজের পরিচিতিতে যতগুলি খবর কানে এসেছে, তার মধ্যে এইটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে শীতলের। ক্ষণিকের জন্য সে নথুনার মেয়ে বউএর কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে। ভুটো কুকুর অনেকদিনের পর তাকে খুঁজে পেয়ে পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে, সেদিকে তার খেয়াল নাই⋯নাম? খট্‌ খট্‌ খট্‌ খট্‌⋯বাপের নাম? খট খট খট খট! জাত? খট খট খট খট। পেশা? খট খট খট খট।⋯অ্যাঁ! বলিস কি!⋯এতো লাল টকটকে সাহেবের বাবা রে!⋯

আরও কত খবর জজসাহেবের সম্বন্ধে। রাত্রিতে ঢোল-করতাল বাজিয়ে গান হচ্ছিল বাঙলার কাছের দুসাধটুলীতে ; ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল বলে তাদের ঢোল ফুটো করে দিয়ে এসেছে সাহেব।⋯হরিহর প্রসাদ উকিল 'আর্গুমেন্ট' করবার সময় এক কথা দুবার বলেছিল বলে তার ভাল আপীল খারিজ করে দিয়েছে।

দায়রা কেসের সাক্ষী এক দারোগাকে, ডিগ্রেড করবার জন্য

পুলিসসাহেবের কাছে লিখেছে, ইংরাজি কম জানে বলে।...বয়স বেশী নয়; বিয়ে করেনি এখনও সাহেব। এ কয়দিনে একবার শুধু সাহেবকে একটু হাসতে দেখা গিয়েছে-- সেও ইংরাজিতে হাসি। পেশকারবাবুকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করেছিল--এ জেলার বেশীরভাগ লোকের চাপদাড়ি গজায় না কেন? থুতনির নীচে গোটাকয়েক চুলওয়ালা দাড়িতে লোককে একটু চোর চোর গোছের দেখতে লাগে। এই বলে মুচকে হেসেছিল সাহেব।

আরও কত খবর গত পাঁচদিনের মধ্যে জমা হয়েছে। কিন্তু সে সবের কোন মূল্য নাই শীতলের কাছে। এক কান দিয়ে শুনছে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

খট খট খট খট! এজলাসের মধ্যে। শুধু এই একটা জিনিস থেকে সে নতুন জজসাহেবকে বুঝে গিয়েছে।

এর পর হল কাজের কথা। যে রকম কড়া লোক সাহেব, তাতে সম্ভবত তাঁর মোটর ড্রাইভারের কাজ কিছুতেই নথুনীকে করতে দেবেন না। ওঁর গাড়ি এখনও এখানে এসে পৌছয়নি। আজকালের মধ্যে পৌছে যাবে। রেকর্ড অফিসের 'পাঞ্চিং ক্লার্ক'এর চাকরিটাও নথুনীর পক্ষে রাখা অসম্ভব, কেননা সে নিজের নামটা পর্যন্ত দস্তখত করতে জানে না। আর এরকম বাঘা সাহেবের কাছে তার হয়ে গিয়ে কেউ দুটো কথা বলে আসবেন, সে বুকের পাটা সেরিস্তাদারবাবুরও নাই। সেইজন্য নথুনী ভাবছে নিজে থেকেই কথাটা বলবে জজসাহেবের কাছে—চাকরি তো নইলে এমনিও থাকবে না, অমনিও থাকবে না। এখনও সে জজসাহেবের বাঙলার আউটহাউসেই আছে। সাহেব তাকে লক্ষ্য করেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না; দেখে থাকলেও ভেবেছে, আগেকার জজসাহেবের ড্রাইভার কোন কাজের জন্য থেকে গিয়েছে—দুদিন বাদে চলে যাবে। এই অবস্থায় তার স্ত্রী ও মেয়েকে সে কি করে জজসাহেবের বাড়ির 'আউটহাউস'এ নিয়ে গিয়ে রাখে?

"এরই মধ্যে শীতল, তুই এই সব আপদ নিয়ে এসে জুটোলি।"

দেখা গেল, শীতলও অনুতপ্ত হতে জানে। অনবরত সাহেব খট খট খট খট করে সাক্ষীর এজাহার লেখেন। অবস্থা সত্যিই গুরুতর। ভুল করেছে সে এদের এনে।

ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক বুঝতে না পারলেও, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে নথুনীর বউ ও মেয়ের।

একটু কাঁচুমাচু হয়ে শীতল বন্ধুকে আশ্বাস দেয়—"আরে তার জন্য ভয় কিসের। না হয় তাড়িখানায় ঘুগনিই বেচবি, আমি না কোন চার পয়সার কিনব রোজ!" বলে, কিন্তু জোর পায় না। কথাটার প্রাণ নাই, ফাঁকা আশ্বাস।

নথুনীর স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে গিয়ে শীতল তখনকার মত ওঠাল পেশকারবাবুর বাড়ির বাইরের বারান্দায়।

পরের দিন শীতল জজসাহেবের এজলাসে পাখা টানতে গেল। সেখানে অন্য লোক কাজ করছে। তবে টানাপাখা উঠে যাবে; ইলেকট্রিসিটির তার লাগানো হয়ে গিয়েছে দেয়ালে; এখন এ কয়দিনের জন্য কেউ আর তার উপর কড়া হতে চায় না। যে ছোঁড়াটা তার জায়গায় কাজ করছিল, তারও সাহস নাই শীতলকে চটায়।

শীতলের কৌতূহল নতুন জজসাহেবকে একবার নিজে চোখে কাজ করতে দেখবে। চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন সে করতে চায়। দুহাতের আঙুল ঠুকে সাক্ষীর এজাহার লিখবে? কলেক্টরের চাইতেও বড় যে জজসাহেব, টেবিলের উপর তার সম্মুখে থাকবে টাইপ করবার যন্ত্র? উকিলের জেরার উত্তর শুনবে, আর খট খট খট খট? ...অ্যাঁ?...

জজসাহেব এজলাসে ঢোকেন কাঁটায় কাঁটায় এগারটায়। আজ পাঁচ মিনিট দেরী হয়েছে। আরদালী ফিস ফিস করে খবর দিয়ে গেল,—আজ ওঁর মোটরগাড়ি এসে পৌঁছেছে কিনা স্টেশনে —তাই।

প্রথমেই আরদালী এসে টাইপ করবার যন্ত্রটা রেখে গেল টেবিলের উপর। উঠে দাঁড়িয়েছে শীতল।...জুতোর শব্দ। আসছে।... পেশকারবাবু আর গাউনপরা উকিলের দল উঠে দাঁড়িয়েছে। ঝুঁকে সেলাম করছে সবাই সাহেবকে। সাহেব চেয়ারে বসে মাথার উপরের টানাপাখার দিকে তাকালেন; তারপর 'পাংখা-পুলার'এর দিকে। অদ্ভুত চেহারার লোকটাকে তিনি দেখছেন ভাল করে। চোখোচোখি হল সাহেবের সঙ্গে। এতক্ষণে শীতলের মনে পড়ে যে, সাহেব আর তাঁর টাইপ করবার যন্ত্রটাকে দেখবার মানসিক উত্তেজনায় সে পাখা টানতে ভুলে গিয়েছিল। তাকাচ্ছে সাহেব তার দিকে। কড়া চোখ। চটেছে বোধ হয়। ভুল শোধরাবার জন্য শীতল প্রাণপণ শক্তিতে দড়ি ধরে টানতে আরম্ভ করে। পাখা যে প্রায় ছাত পর্যন্ত ঠেকছে, সেদিকে তার খেয়াল নাই। পেশকারবাবু পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কি কতকগুলো কাগজ নিয়ে যেন। সাহেব কিন্তু এখনও তারই দিকে তাকিয়ে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। একটু নার্ভাস হয়ে পড়ে সে। ঢাকনাটা খোলবার জন্য, টাইপ করবার যন্ত্রটার উপর হাত দিয়েছে সাহেব। পেশকারবাবুকে কি যেন বললে। গাউনপরা উকিলের দলও পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছে। সকলের মুখে একটু যেন কৌতুকের হাসি। তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে নাকি সাহেব? মেজাজ বিগড়ে গেল তার। অজানতে নিজের দাড়ির উপর একবার হাত বুলিয়ে নিল। তার দাড়ির কথা বলছে নাকি সাহেব? সে তো এ জেলার লোক নয়—তার তো চাপদাড়ি। তবে? এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারটা, পেশকারবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন—"সাহেব বলছেন তোমার কাপড়-জামা অত নোংরা কেন?"

"এই জামাটা হুজুর একজন জজ-সাহেবের। হুজুর যদি গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে একটা উর্দি মঞ্জুর করিয়ে দেন, তাহলে এ অধমের বড় সুবিধা হয় কাপড়-জামা পরিষ্কার রাখবার।"

উদ্‌গত হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন উকিলবাবুরা। সাহেব

টাইপরাইটার যন্ত্রটার উপর ঝুঁকে পড়েছেন। শীতল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখা টানছিল—এখন টুলটাতে বসল। অন্যদিকে নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে সে পাখা টানছে আস্তে আস্তে। জানিয়ে দিতে চায় যে, এইসব 'থাড়কেলাসী' আঙুল দিয়ে খট খট করনেওলা চাকরি-খানেওয়ালা জজসাহেবের সে পরোয়া করে না। তার দিকে তাকালে এবার সে-ও সাহেবের দিকে কটমট করে তাকাবে। ভাবে কি সাহেব তাকে? আর কটা দিনেরই বা চাকরি! অত খাতির কিসের! ইংরাজিতে ফুটানি দেখাচ্ছে শয়তান সাহেবটা ওই খট খট শব্দর মধ্যে দিয়ে। আদালত-ভরা এতগুলো লোককে বাঁদর নাচাচ্ছে ওই খট খট শব্দটা করে। নথুনীকে চাকরী না দেওয়া, উকিলদের অপদস্থ করা, স্টেনোগ্রাফারকে অপমান করা, দারোগার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা, সব কিছুর মূলে ওই খট খট খট খট শব্দটা। মুহূর্তের মধ্যে সাহেবের সব শয়তানীর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই কানে-বিষ-ঢালা শব্দটা!

নথুনীটার সঙ্গে দেখা হল না বিকালে। স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি সে। এড়িয়ে চলছে। ওটার সঙ্গে পেরে ওঠা যাচ্ছে না কিছুতেই।

ভেবেছিল নথুনীর সঙ্গে মদের দোকানে অব্যর্থ দেখা হবে সন্ধ্যাবেলায়। কিন্তু সেখানেও হতাশ হল শীতল। সেখানে দেখা হল জজসাহেবের মেথরের সঙ্গে, সেও ঠিক বলতে পারল না নথুনীর খবর। মেথরটা এসেছে একা—অর্থাৎ স্ত্রীকে সঙ্গে আনেনি। লক্ষ্মীছাড়া নথুনীটা ভেবেছে কি! ওটাকে ঠাণ্ডা করতে কতক্ষণ। কার পাল্লায় পড়েছে জানে না!

শীতল তখন বোতল দাস কাস্তেটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে জজসাহেবের কম্পাউণ্ডে ঘাস কাটতে। রাত নটার সময় জজসাহেব নিশ্চয়ই নিজের কামরাতেই থাকবে।

প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। বহু বছরের সম্পর্ক তার এই কম্পাউণ্ডটার সঙ্গে; এর প্রতিটি অংশ তার খুঁটিয়ে জানা।…হ্যাঁ, আলো জ্বলছে

সাহেবের ঘরে। সে গিয়ে বসে আউটহাউস থেকে খানিকটা দূরে। কাস্তে হাতে আছে বটে, কিন্তু ঘাসকাটা এখন তার উদ্দেশ্য নয়। * সে এসেছে লক্ষ্মীছাড়া নথুনীটার চালচলন পরখ করতে। ওটাকে বোধ হয় বেশ করে কয়েক ঘা উত্তম-মধ্যম না দিলে চলবে না। বউ মেয়ে এখানে পড়ে রয়েছে—একবার গিয়ে দেখা করল না। চাকরি যাবার ভয়ে এত কি মন খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, দুপা হেঁটে বউ-মেয়ের কাছে যেতে পারে না। মদের দোকানে না যাওয়াটা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

চোখ দুটো তার জ্বলছে। অন্ধকারেও সে দেখতে পায়। তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ মেথরের ঘরের দিকে। আজ কুপীটা পর্যন্ত জ্বলছে না সে ঘরে। এখানকার সকলের নাড়ীনক্ষত্র তার জানা। যদি নিজে পথ চিনে ফিরে আসবার অবস্থা থাকে, তাহলে মেথর ফিরবে রাত দশটায়। ঘাস কাটবার শব্দ হবার ভয়ে শীতল হাত গুটিয়ে বসে আছে।

বহুক্ষণ এইভাবে বসে থাকে। একদিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অন্ধকারটা যেন আরও ঘন হয়ে ওঠে; তখন একবার করে চোখ বুজে নিলে ঝাপসা ভাবটা বুঝি একটু কাটে। এ কি? অন্ধকার যেন একটু নড়ল।...নড়ল কেন?...নড়ন্ত কম-অন্ধকারটুকু তাড়াতাড়ি এগুচ্ছে মেথরের ঘরের দিকে।

হতভাগা!

উঠে দাঁড়িয়েছে শীতল। হাত আর কাঁধের পেশীগুলো তার ফুলে উঠেছে। জজসাহেবের বিলাতী কুকুরটা মেথরের ঘরের দিক থেকে তার গায়ের গন্ধ পেয়ে ছুটে এল। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে চলেছে মেথরের ঘরের দিকে। কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—বুঝতে চেষ্টা করছে ব্যাপারটা।

* এর পরের ব্যাপারটুকু বেশী সময় নেয়নি। আর সেটুকু সংক্ষেপে

বলাই ভাল। তার হাতের এক ঝটকায় যে লোকটা মেথরের ঘর থেকে বাইরে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সে লোকটা নথুনী নয়—জজ-সাহেব।

পরের দিন এগারটার সময় আদালত একেবারে সরগরম। গুজ-গুজ করে কথা হচ্ছে, এখানে সেখানে। শীতলের দর বেড়েছে আজকের, বাজারে। সকলেই তার সঙ্গে কথা বলতে চায়—উকিল আমলা সবাই। অনেক কথা জানতে চায়—আরও বিশদভাবে জানতে চায়—জেনে নিজের নিজের গায়ের ঝাল মিটোতে চায়। যেটুকু না বললে নয়, তার অতিরিক্ত কিছুই শীতলের মুখ থেকে বার করা গেল না।

"আজ সাহেব ঠাণ্ডা। আজ আর এজলাস ঘরে খট খট খট খট করে ফুটানি মারবে না।" অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

সে যা ভেবেছে তাই বলেছে। খট্‌ খট্‌ খট্‌ খট্‌ শব্দটা এজলাসঘরে না হলেই, আদালত ঠাণ্ডা। চিরকাল যেমন চলে আসছিল তেমনি চলবে। ডিক্রিজারি মোহরারের চাকরি যাবে না, স্টেনোগ্রাফারকে পাঁচশবার বানান লিখতে হবে না। উকিলবাবুরা আর্গুমেণ্ট করবার সময় এক কথা পাঁচবার বলতে পারবেন, আমলারা নথি দেখিয়ে টাকা নিতে পারবে।

এই উত্তেজনাময় পরিবেশে, কখন থেকে যেন সকলেরই মনে শীতলের যুক্তিহীন মতটা সংক্রামিত হয়েছে। ক্ষণিকের জন্য সাহেবের বিরুদ্ধে সমস্ত বিদ্বেষ গিয়ে কেন্দ্রিত হয়েছে তাঁর টাইপ করবার যন্ত্রটার উপর। যে আধপাগলা লোকটাকে কেউ কোনদিন আমল দেয়নি, আজ তার অনায়াস সম্মোহন, আদালতসুদ্ধ লোককে তার ধরনে ভাবতে বাধ্য করাচ্ছে। পাখার দড়ি হাতে, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে শীতল দরজার দিকে।...ওই যন্ত্রটার উপরই নথুনীর, আর তার স্ত্রী ও মেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।...উৎকণ্ঠার ছাপ পড়েছে শীতলের চোখেমুখে। সে সকলকে বলেছে বটে যে সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু

শেষমুহূর্তে আত্মবিশ্বাস একটু হারিয়েছে! ভরসা পাচ্ছে না।···আসছে! সাহেবের খাস আরদালী! এখনই সাহেব আসবে। আমলাদের নজর আরদালীটার উপর।

···ঠিক যা ভেবেছিল শীতল!···ঠিক তাই!···আরদালীটা জজ-সাহেবের টেবিলের উপর এনে রাখল একটা ছোট ক্যাশবাক্স। শুধু এইটা।···আজ আর খট্ খট্ খট্ খট্ যন্ত্রটা আনেনি! আর কোন চিন্তা নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে। নথুনীটার চাকরি নিশ্চয়ই থাকবে; সাহেব নিশ্চয়ই আজ পেশকারবাবুর সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলবে; রাতের ভজনগানের ঢোল আর কেউ ফুটো করবে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে শীতল।

জজসাহেব এজলাসে এসে ঢুকলেন। চাউনির ঝাঁজ মরেছে। বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। সাধে কি আর খট্ খট্ খট্ খট্ বন্ধ!

···সাক্ষীর নাম? খট্ খট্ খট্ খট্। ···বাপের নাম? খট্ খট্ খট্ খট্ ....পেশা? খট্ খট্ খট্ খট্।···আজ এই প্রথম হাসি এল শীতলের, কালকের এজলাসের সেই কথা ভেবে।

একটি কিংবদন্তীর জন্ম

ওষুধের গন্ধর সঙ্গে চন্দনের মৃদু সুবাস এসে মিশেছে রুগীর ঘরে।

"ব্যাস করো!"

বন্ধ করো! নওরঙ্গী চৌবের হুকুম। বিধাতার নির্দেশের মত অমোঘ। বাঁধকে কিম্বা রুককে বলে গাড়ী থামালে, সে গাড়ী আবার চলে। লাল সিগনাল উঠলে আবার নামে। কিন্তু এ হল অন্য জিনিস।

কাঠির মত সরু হাতখানায় সিগনাল ওঠাতে গিয়ে, নড়ল খালি তারী আড়ষ্ট দুটো আঙুল। যার আঙুলের ইশারাতে এখানকার দাও-দাও-নাও-নাওএর অফুরন্ত এই চোখ-ধাঁধানো আবর্ত্ত চলছে, তাঁর একটা আঙুল নড়লেও যথেষ্ট হত।

মালিকের ভাষা বোঝে ম্যানেজার নাটোয়ার চৌধরী। বাপের সময়কার বিশ্বস্ত কর্মচারী। অনেককাল ওই আঙুলের ইশারার হুকুম তামিল করেছে। কত রকমের কাজ অকাজ-কুকাজও। কুকাজের পরিমাণ সং কাজের চেয়ে কম নয়।...চন্দনের গন্ধটা হঠাৎ উগ্র হয়ে এসে নাকে লাগে।

মুহূর্ত্তের জন্য চাঁপিয়া থেমে গিয়েছে। মালিকের সর্বাঙ্গে চিমটি কেটে কেটে আরাম করে দেওয়া তার কাজ; শুধু সে নয়—আরও জনকয়েক আছে। ডিউটি বদলায় পালা করে না করলে একজনে পারবে কেন। বেটাছেলেদের দিয়ে এ কাজ হয় না। আঙুলের ডগা নরম হওয়া চাই। একি এলোপাথাড়ি খামচানি? চেষ্টা করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এ কাজ শিখতে হয়। বয়স থাকতে চাঁপিয়ার মা মালিককে এই আরাম করে দিত। চাঁপিয়া বড় হলে শেখে এই কাজ মায়ের কাছ থেকে। আবার সেও জনকয়েককে শিখিয়েছে

এরা সবাই এখানকার অনুন্নত শ্রেণীর লোকের বাড়ীর মেয়ে—স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করে। চাঁপিয়ার চিমটিই মালিকের সবচেয়ে পছন্দ। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোট ছোট চিমটি বহুকালকার অভ্যস্ত বিলাসের অভিজ্ঞতায়, নওরঙ্গী চৌবে শুধু চিমটির চাপ থেকে চোখ বুঁজে বলতে পারেন, সেবাদাসীটির বয়স আন্দাজ কত। চিমটি থামলেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়; তাই কারও ঢুলবার উপায় নাই।

নাই বা থাকল হাড় আর চামড়ার মাঝের ইস্পাতের মত পেশীগুলো আজ মালিকের; তবু তাঁর হাত তোলবার প্রাণপণ চেষ্টাটা চাঁপিয়া নিজের আঙুলের ডগায় অনুভব করতে পারে।...তবে কি মালিক চিমটি কাটা বন্ধ করতে বলছেন? সে তাঁর মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে না ঠিক। তারপর তাকাল ম্যানেজার সাহেবের মুখের দিকে। বোঝা গেল না তবু। যার বোঝবার সে ঠিক বুঝেছে।

ব্যস করো! আর না!

একমাত্র নাটোয়ার চৌধরীই জানে এর মানে। আর বোধ হয় শুনলে খানিকটা আন্দাজ করে নিতে পারতেন বলভদ্র উকিল। তিনি এখন রুগীর ঘরে নাই।

আর হরবিলাস চৌবে? নওরঙ্গী চৌবের ওই একই ছেলে। সে কতটুকু বুঝল? সে তো এখনই ঘরে ঢুকেছে। খানিক আগেই সে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল। মাইল দেড়েক দূরে তাঁদের বিশাল প্রাসাদ—এখানে সকলে বলে 'ডেউড়ি'। বড় ডাক্তার, ছোট ডাক্তার, নার্স, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, কবিরাজ সবাই থাকেন তিন নম্বর 'গেস্ট-হাউস'-এ—ডেউড়ির কাছে। রুগীর কাছে আসতে পারেন ডাক পড়লে—নইলে নয়। খানিক আগেই দেখে গিয়েছেন তাঁরা। ছেলেরও এ বাড়ীতে আসবার অধিকার কোনকালে ছিল না। অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও, বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি হবার পর থেকে, দিনে দুবার ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আজকাল আসেন। ডাক্তারবাবুদের

'গেস্ট-হাউস'এ পৌঁছে দেবার সময় রুগীর আধুনিকতম খবরে চিন্তিত হয়ে আবার এসেছেন। এখানে একলা আসা তাঁর এই প্রথম।

'ব্যস করো!' আর নয়। বাবা বোধহয় বলছেন যে, আর ওষুধ খাবেন না। ওষুধ খাওয়া বৃথা সে কথা বাবা ডাক্তারকেও বলেছেন। আজ প্রথম নয়, এর আগেও বলেছেন; কিন্তু আজকের বলাটার সুর আলাদা। চেনা সুর। নড়চড় নাই এ সুরের কথার। হুকুম। মুখ থেকে বার হবার যেটুকু দেরী; তারপর কার ঘাড়ে কটা মাথা যে নওরঙ্গী চৌবের হুকুম তামিল করবে না! রোগে উত্থান শক্তি রহিত হলেও।...চন্দনের গন্ধতেও মনে হচ্ছে যেন ঝাঁজ আছে।

বুড়ো নাটোয়ার চৌধরী হরবিলাসের মুখ দেখে বুঝে নিল যে, ছেলে বাপের হুকুমের মানেটা ঠিক ধরতে পারেনি।...পারবে কেমন করে?

চন্দনের মৃদু গন্ধটা হঠাৎ উগ্র মনে হচ্ছে চাঁপিয়ার সয়ে যাওয়া নাকেও। চন্দন কাঠের কথাটা যে গ্রাম সুদ্ধ সবার জানা। গ্রাম সুদ্ধ কেন—জেলা সুদ্ধ। নওরঙ্গী চৌবের সব কথাই জেলা সুদ্ধ সকলের জানা—শুধু একটা কথা ছাড়া।

চাঁপিয়া দেখছে, ম্যানেজার সাহেব ঝুঁকে পড়েছেন মালিকের মুখের দিকে, কথা বোঝবার জন্য। জোরে জোরে কথা বলবার ক্ষমতা যে তাঁর এখন নাই।

"হুকুম, মালিক।"

মালিকের রুগ্ন পাণ্ডুর চোখমুখে উত্তেজনার ছাপ। উৎকণ্ঠায় চাঁপিয়া নিজের ডিউটি ভুলে গিয়েছে। মালিক ভুলে গিয়েছেন যে, কেউ আর এখন তাকে চিমটি কেটে আরাম করে দিচ্ছে না।

...কী যেন বলবেন মালিক এবার! রোগের কথা নয়; কাজের কথা।...কী এত কাজের কথা? ম্যানেজার সাহেব কান নিয়ে এসেছে একেবারে মালিকের মুখের কাছে!...

চন্দন কাঠের গন্ধ।

"ব্যস করো! নাটোয়ার, ব্যস করো!...বন্ধ করো হিসাবের দ' খাতা।...আর নয়। যত কাল চলল, চালালাম।...তুমিই সাক্ষী নাটোয়ার—একটা পয়সা এদিক ওদিক হতে দিইনি। পাই পাই হিসাব রেখেছি।...উপর থেকে তিনি যে সব দেখছেন!...কাউকে ফাঁকি দিইনি। দিলে যে ফাঁকিতে পড়তাম নিজেই।...সেবার যখন কমিশনার সাহেব আমাকে রাজাসাহেব খেতাবের জন্য সুপারিশ করতে চেয়েছিল, তখন আমিই হাত-জোড় করে বারণ করেছিলাম তাঁকে। সেই খেতাবের মধ্যে যে এই জিনিসের ছোঁয়াচ।...সে সব কথাতো তোমার জানা।..."

মালিকের চোখমুখে তৃপ্তির আভাস—আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য করে আসবার সন্তোষ।

"হুজুর।"

"বলভদ্র উকিল।"

হুজুর বলভদ্র উকিলকে ডাকছেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ম্যানেজার সাহেব ঘর থেকে। এই বয়সেও তাঁর গতিভঙ্গীতে কোন রকম আড়ষ্টতা আসেনি। বলভদ্র উকিল আছেন এখন তিন নম্বর 'গেস্ট-হাউস'এ। সেখানে তো যাচ্ছেনই নাটোয়ার চৌধরী; কিন্তু তার আগের কাজ যে বাকি। এক মিনিটের তো কাজ। সেটাকে সেরে নিতে হয়। কাজ ফেলে রাখা, তাঁর কোষ্ঠীতে লেখেনি।

...ব্যস করো! বার করো! রুগীর মুখের অস্পষ্ট কথাটা প্রথম ওই রকমই লেগেছিল। বার করে দাও ফটোগ্রাফারবাবুকে। ফটোগ্রাফারবাবু মালিকের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ম্যানেজার সাহেব গলা খাঁকার দিয়ে তাঁর পরদা দেওয়া ঘরে ঢুকে কি যেন বললেন। মালিকের শখের ফটোগ্রাফির ঘর—ঝি-চাকরের পর্যন্ত ঢুকতে মানা এ ঘরে। ফটোগ্রাফারবাবু যেন তৈরীই ছিলেন। হাতে স্যুটকেস, গলায় ক্যামেরা ঝোলানো—বেরিয়ে এলেন তিনি নাটোয়ার চৌধরীর সঙ্গে। মালিকের হুকুম অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ঘরখানায় তালা

দিয়ে, চাবিটা পকেটে পুরলেন ম্যানেজার। ঘরের বাইরে বারান্দা। বারান্দার নীচে গোবর দিয়ে নিকানো প্রকাণ্ড উঠান। তারপর সারি সারি অনেকগুলি ফসল রাখবার গোলা। সমস্ত জায়গাটা বাঁশের জাফরির মজবুত বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারই বাইরে দাঁড় করানো মোটর গাড়িতে গিয়ে বসলেন দুজনে।

"তিন নম্বর গেস্ট-হাউস!"

সুরসিক নওরঙ্গী চৌবে সুস্থ অবস্থায় বলতেন—আজকালকার দিনে "উৎসবে ব্যসনেচৈব"...শ্লোকটা পুরনো হয়ে গিয়েছে; আজকাল বন্ধু হয় তিন রকমের—ক্ল্যাশ ফ্রেণ্ড, গ্ল্যাস ফ্রেণ্ড, আর ফ্ল্যাশ ফ্রেণ্ড। ফ্ল্যাশ এক রকমের তাসের জুয়ো খেলার নাম। বলভদ্র উকিল ছোট বেলায় কিছুদিন নওরঙ্গী চৌবের সঙ্গে পড়েছিলেন; দুজনে এক ক্লাসের ইয়ার এবং এক সঙ্গে তাসের জুয়ো খেলতেন এখানে এলেই। অর্থাৎ সব রকমের সংজ্ঞা অনুযায়ী বলভদ্র উকিল মালিকের বন্ধু। যবে থেকে রুগীর অবস্থা খারাপের দিকে গিয়েছে, তবে থেকে তিনি কোর্টের কাজকর্ম ফেলে এখানে রয়েছেন। অবশ্য মোটা দৈনিক 'ফি'তে।

এক একবার মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ায় রুগীর ওখান থেকে আর অমনি সাড়া পড়ে যায় 'ডেউড়ি'তে। যে উঠে না দাঁড়ায়, সেও নড়ে চড়ে বসে। কান খাড়া রাখে সবাই, মালিকের আধুনিকতম খবর জানবার জন্য। অনেকে গাড়ী কোথায় থামবে সেইটার আন্দাজ করে নিয়ে আগে থেকে সেই দিকে ছুটতে আরম্ভ করে। অন্দরমহলের দরজা খুলে ছুটে আসে চৌবে গৃহিণীর খাস দাই, আর গেস্ট-হাউসগুলো থেকে আসে অনেকে।

কিন্তু কারো দিকে তাকাবার ফুরসৎ নাই এখন ম্যানেজার সাহেবের। তিনি নামলেন গাড়ী থেকে একা।

"ফটোগ্রাফারবাবুকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে, তুমি গাড়ী এনে রাখবে তিন নম্বর গেস্ট-হাউসে ডাক্তারবাবুদের ঘরের সম্মুখে! কোন লোক

আনবে না স্টেশন থেকে, বলে দিচ্ছি! আর আমাকে জিজ্ঞাসা না করে গাড়ী তিন নম্বর গেস্ট-হাউসের সম্মুখ থেকে সরাবে না।"

"হুজুর!"

"যাও!"

গেস্ট-হাউসের লোকরা ঘিরে ফেলেছে তাঁকে। বলভদ্র উকিলও আছেন। চোখোচোখি হ'ল দুজনের। ঠিক ধরতে পেরেছেন বলভদ্র উকিল না-বলা কথাটা। ডাক্তারদের ঘরের সম্মুখে একখানা গাড়ী সব সময় রাখা থাকে—কখন কি দরকার লাগবে বলাতো যায় না। সেই গাড়ীখানার দিকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন ম্যানেজার সাহেব। পিছনে বলভদ্র উকিল। গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরেছেন তিনি উকিলবাবুকে ঢুকতে দেবার জন্য। একটু নার্ভাস আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন উকিলবাবু। গাড়ীর দরজা বন্ধ করবার সময় নাটোয়ার চৌধরী যদি বলভদ্র উকিলের হাতখানাকে সরিয়ে না দিতেন তাহলে তাঁর আঙুলগুলো থেঁতলে যেত।

এইবার বুঝি তাঁর সময় হ'ল। সবাই ম্যানেজার সাহেবের দিকে এগিয়ে আসতে চায়, তাঁকে প্রশ্ন করতে চায়। রুগীর শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করা শুধু একটা অছিলা মাত্র তার পরের কথাটাই আসল। নতুন হুকুম জারি হয়ে গিয়েছে খানিক আগে সে খবর এরা এখনও জানে না।

কমিশনার সাহেব আসছেন!···খবর দিলেন চাপা গলায় খয়ের খাঁ এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জন।"···খানিক আগেই এসেছেন!"···অর্থাৎ সবাই পথ ছেড়ে দাও। সবচেয়ে আগে তাঁরই অধিকার ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে কথা বলবার!···কমিশনার সাহেবের সঙ্গে আলাপ জমাবার ছলে, অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন এক নম্বর গেস্ট-হাউসে গিয়ে, রুগীর অবস্থার কথা জানিয়ে এসেছেন। তবু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছেন, তার আশা ছাড়েন নি একেবারে এখনও। অন্য দিন হলে নাটোয়ার চৌধরী নিজেই আগিয়ে যেতেন ডিভিজনাল কমিশনারকে সেলাম করবার জন্য

কিন্তু আজ যে এ সব বন্ধ করবার হুকুম হয়ে গিয়েছে। কমিশনার সাহেব রুগীকে একবার দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব পাড়লেন ম্যানেজারের কাছে।

"না।"

শুকনো দৃঢ় জবাব। বেশী কথা বললে, বা এখানে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে পেয়ে বসতে পারে, এই ভয়ে অতি সংক্ষেপে বলা।

বিস্ময়ের ঝাঁকানি লাগা এতগুলি লোকের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবারও দরকার বোধ করলেন না নাটোয়ার চৌধরী। কারও কথা কানে যাচ্ছে না। তাঁর এখন বহু কাজ! সময় নাই মোটে। অন্দর-মহলের দাইটা ভিড় ঠেলে আসতে পারছে না কাছে। তার দিকে ছুটে গেলেন ম্যানেজার সাহেব।

"মালিকানীকে বলে দিস যে মালিক একই রকম আছেন। ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন এখন।" মিথ্যা আশ্বাস দিতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না এখানে।...বাড়ীর মেয়েদের এখন বোধহয় একবার রুগীর ওখানে যেতে দেওয়া দরকার!...কিন্তু এখনও যে হুকুম হয়নি মালিকের!... এখানকার দরবারের কারও সাহস নাই নওরঙ্গী চৌবের হুকুমের একটুও নড়চড় করে।

হ্যাঁ, দরবারই বটে। রাজা নয়, জমিদার নয়, তবু এটা একটা দরবার। নওরঙ্গী চৌবে সম্পন্ন গেরস্ত—এদেশে বলে 'কষাণ' ধনী গৃহস্থ। গঙ্গার ধারে দু'হাজার বিঘে জমি আছে। পলিমাটি পড়া 'দিয়ারা' জমি। জল সরবার পর কালো পাঁকের উপর শুধু ছিটিয়ে কলাই ফেলে দাও; হাল দেবার দরকার নাই; চারা পোঁতবার দরকার নাই; ক্ষেত নিড়াবার দরকার নাই; আর কোন খরচ নাই; সোনার ফসল বাঁধা; শুধু কেটে ঘরে তোলবার মেহনত।

আর আছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ লাঠির জোর, সরকারী মহলে উপর পর্যন্ত পরিচয়ের জোর, অগ্র-পশ্চাৎ বোধহীন জিদের জোর, যাকে ইচ্ছা কিনবার মত অর্থের জোর।

এখান থেকে দেড় মাইল দূরে নওরঙ্গী চৌবের পৈতৃক ভিটে। তিনি চিরকাল সেখানেই থাকেন। ওই খোলার ঘরে তাঁর বাবাও থাকতেন এক সময়। সেই খাপরার বাড়ীটাকে সবাই বলে 'ভিটা বাংলা'। বাড়ীর লোকের সেখানে যাবার হুকুম নাই। তাই অন্দরমহলের মেয়েদের চোখে 'ভিটা বাংলা' এক রহস্য ও কৌতূহলের জ্যোতির্মণ্ডলে ঘেরা। এত দেখবার ইচ্ছা, খুঁটিয়ে জানবার ইচ্ছা, তবু সেখানে যাবার নামে বাড়ীর মেয়েদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। ঠাকুমার মুখে শোনা যে সেখানে যাবার দুর্লভ সুযোগ আসে এমন সময়, যখন গিয়ে চোখের জলে কিছুই দেখা যায় না। সে অনুমতি, সে সুযোগ বাড়ীর লোক চায় না। তার চেয়ে হে রামচন্দ্রজী ভগবান, বাড়ীর মেয়েদের যেন যেতে না হয় সেখানে—রোগ সারিয়ে দাও মালিকের!

নওরঙ্গী চৌবে প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ভোজন করতে আসতেন 'ডেউড়িতে'; তারপর বিশ্রাম করতেন সেখানেই। দুপুরে বিশ্রামের সময় মালিকানী স্বামীর গায়ে চিমটি কেটে কেটে আরাম করে দিতেন। দাইয়ের মুখে শোনা যে তিনি এই বিদ্যার সূক্ষ্ম কলাগুলো আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন চাঁপিয়ার মাকে অন্দরমহলে ডেকে এনে।

নওরঙ্গী চৌবে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে মর্যাদা দিতেন পুরো। কেউ কোনদিন বলতে পারবে না যে, তিনি তাঁদের অনুরোধ কখনও উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু যে বিষয়টা বাড়ীর লোকেরা তাঁকে বলি বলি করেও বলতে পারেননি, সেটা হচ্ছে তাঁর অপরিমিত খরচ সংক্রান্ত কথা। এ অনুরোধ তিনি হয়ত রাখতেনও না।

কিন্তু আজ হুকুম হয়ে গিয়েছে—"ব্যস করো।" বন্ধ কর। সবচেয়ে প্রথমে গেষ্ট-হাউস-গুলো। এক এক শ্রেণীর লোকের জন্য এক এক রকমের গেষ্ট-হাউস। এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর—গেষ্টহাউস। মাইনে, আর্থিক অবস্থা, যশখ্যাতির পরিমাণ দিয়ে ঠিক হয় কার কোন্ গেষ্টহাউসে জায়গা হবে। এ ছাড়া আরও একটা সাধারণ অতিথিশালা

আছে। সেখানকার ব্যবস্থা ধর্মশালা গোছের—নিজে ইঁদারা থেকে জল তুলে স্নান করো, খাটিয়াতে নিজের বিছানা পেতে শোও, রান্নাঘরে গিয়ে ভাত, অড়রের ডাল আর একটা ভাজি খেয়ে এস।

প্রার্থীদের ভীড়। অফিসারদের আস্তানা। ঢালাও ব্যবস্থা। অতিথিশালাগুলো সব সময়ে সরগরম। সরকারী কর্মচারীরা আসেন সাধারণতঃ টুরের অছিলায়। আশ্রয়, আদর, আপ্যায়ন ছাড়াও অনেকের অন্য চাহিদাও থাকে। সবরকম চাহিদা মিটাবার আয়োজন আছে। এই আদর আপ্যায়নের শঙ্খবিষে জর্জর সরকারী কর্মচারী মহল যার হাতের মুঠোয়, সে লোক ভয় করবে কাকে? এমনিতেই ভয়ডর বলে জিনিস কোনকালে নাই নওরঙ্গী চৌবের। জীবন আর পৃথিবীটাকে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। শখের খেয়ালে বল্লম নিয়ে ভুট্টা ক্ষেতে বুনোশুয়োর মারতে যায় রাত্রিতে। পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে নিয়ে শিকার করতে গিয়ে, একা বুনো মোষের দলের দিকে এগিয়ে যায়, কারও বারণ না শুনে। এত আদর আপ্যায়নের ঘটা; কিন্তু কি যেন একটা জিনিস আছে নওরঙ্গী চৌবের স্বভাবে, যে যতবড় অফিসারই হোন না কেন, কেউ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, নিজেকে তাঁর চেয়ে বড় বলে ভাবতে পারেন না।

চেয়ে নিয়ে যাও তাঁর কাছ থেকে যার যা ইচ্ছা—হাত পেতে নাও—মাথা না নোয়ালেও চলবে। কিন্তু একবার নিজের অধিকার ফলাতে এস, আইনের পয়েন্ট দেখাও, থানার পথ ধর,—বুঝতে পারবে নওরঙ্গী চৌবের আসল স্বরূপ। এ খবর এ অঞ্চলের সকলের জানা। ভয়ে কাঁপে সবাই আবার শ্রদ্ধাও করে। শ্রদ্ধা করে দানসাগরকে। এ জেলায় নওরঙ্গী চৌবের নাম হয়ে গিয়েছে দানসাগর। এত যে লোক অতিথিশালাগুলোতে, এরা সব তাঁর দানের প্রার্থী।

দানের খাতার হিসাব লেখেন নাটোয়ার চৌধরী নিজে। খাতাপত্র থাকে তাঁর খাসকামরার খাস সিন্দুকে। আর কেউ জানে না সে

সব খাতায় কি লেখা হচ্ছে না হচ্ছে; এক শুধু বলভদ্র উকিল কিছুটা জানতে পারে।

ব্যস করো, নাটোয়ার চৌধরী! গুটিয়ে নাও 'দ' খাতা। মিটিয়ে ফেল তার শেষ হিসাব নিকাশ কোন্ বিষয়টা কোন্ খাতে যাবে—তার কত রকমের জটিল হিসাব কিতাব! আরও কত দিকের কত কাজ বাকি! ··হিসেবটা সেরে ফেল তাড়াতাড়ি!···তাড়াতাড়ি! এখনই হয়ত আবার ডাক পড়বে 'ভিটা বাংলায়'—বলভদ্র উকিলের কাজটা হতে যেটুকু দেরী!···

কমিশনার সাহেবের আরদালী ছুটে এল। অন্য সব ছোট হাকিমরা একটু গা ঢাকা দিয়ে আছেন দুই নম্বর গেস্ট হাউসে—যাতে কমিশনারের সম্মুখে না পড়েন।

"ম্যানেজার সাহেব আপনিই তো সব। যে কাজের জন্য কমিশনার সাহেব এসেছিলেন, সে কাজ কি আপনার কাছে হতে পারে না? সাহেব যেন সেই রকম কথাই জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"না।"

"তাহলে সাহেবের ষ্টেশনে ফিরে যাবার জন্য একখানা গাড়ী দেন।"

"গাড়ী নাই।"

"ওই যে রয়েছে।"

"ওটার দরকার এখানে। গরুর গাড়ীতে যান তো যেতে পারেন। হাতীও দিতে পারি।"

"তাহলে যে এ ট্রেণ ধরা যাবে না। মোটর থাকতে না দেওয়া কি ঠিক হবে?"

আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না নাটোয়ার চৌধরী।—"সাহেব চটলে বাড়ীতে গিয়ে বেশী করে খানা খাবেন, আর কি হবে?"

আরদালী চলে যাবার সময়, জোরে জোরে পা ফেলে বুঝিয়ে দিল যে সে এই সব কথা এখনই কমিশনার সাহেবকে বলতে যাচ্ছে—পরে যেন তাকে দোষ দেওয়া না হয়।

সকলে দেখল। মুহূর্তের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। সবাই আঁচ করে নেয় আসল ব্যাপারটা। তবু এখনও যদি কিছু আশা থাকে! কি বোকামিই করে ফেলেছেন একদিন আগে না এসে!… আগে ভাগে গেলে, এখনও যদি কিছু মেলে ম্যানেজার সাহেবের কাছে!…

সবচেয়ে আগে এলেন হাতে থলি, মাথায় টুপি, করিতকর্মা রাজনৈতিক দলের নেতা। বার্ষিক বরাদ্দ এক হাজার টাকা।

"নমস্তে! কেমন আছেন দান-সাগর এখন?"

"এখন কি চাঁদা নেবার সময়?"

"একখানা গরুর গাড়ী দিতে পারেন, ষ্টেশনে যাবার জন্য?"

"না।"

নমস্তে!

কত রকমের প্রার্থী। একের পর এক। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, জরাসন্ধের চুল্লীর প্রত্নতত্ত্বীয় খননে আগ্রহশীল ঐতিহাসিক, কনৌজী ব্রাহ্মণ-কুলপঞ্জীর লেখক, কাণপুর অনাথালয়ের সেক্রেটারী, 'ভারতবাণীর' সম্পাদক, ট্রাউজার-পরা শার্টের আস্তিন গোটানো রাজনৈতিক কর্মী, কলেজের অধ্যক্ষ, পকেটে-অফিস ঠগ জোচ্চোর, অখিল ভারত-অমুক-প্রতিষ্ঠান-লেখা-প্যাড-সম্বল প্রার্থী, শিকারের তাঁবু 'বিটার', গাইড প্রভৃতির প্রার্থী সাহেব। বিয়ের দিনের ঘি দুধ দই মাছের জন্য প্রার্থী কোর্টের আমলা—আরও অনেকে। বিভিন্ন মূর্তি, বিভিন্ন পোষাক, বিভিন্ন ধরণ কথা আরম্ভ করবার; বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া নাটোয়ার চৌধরীর দৃঢ় প্রত্যাখ্যানের।…হাত দিয়ে বানের জল আটকাবার মতই দুঃসাধ্য। তবু তারই চেষ্টা করতে হচ্ছে আজ ম্যানেজার সাহেবকে।

"নহী, নহী, নহী। না, না, না।"

এই এক জবাব! এতবার না বলবারও ফুরসত নাই তাঁর এখন। 'না' শব্দটা যেখানে চিরকাল অজানা আর নিষিদ্ধ, সেখানে আজ কেবল 'না'এর পালা।

অতিথিশালার চাকরবাকরদের উপর কড়া হুকুম ছিল এতকাল, কাউকে যেন না না বলে। একবার একজন ঠাকুরকে এই অপরাধে বরখাস্ত করবার আগে, মালিক নিজ হাতে চাবুক দিয়ে তার গায়ের ছাল ছিঁড়েছিলেন। সেই দানসাগরের উৎসমুখ আজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

জানালা দিয়ে নজরে পড়ে ম্যানেজার সাহেবের—একজন ভদ্রলোক আসছেন গরুর গাড়ীতে। হলদে সুটকেশ দেখা যাচ্ছে—নিশ্চয়ই ষ্টেশন থেকে আসছেন।...এখনও কি এর বিরাম নাই!...মোতি সিং! ষ্টেশনে একজন লোক রেখে দাও—নতুন ভিখারীদের আসতে বারণ করতে! অতিথিশালাগুলোতে বলে দাও, যাতে আর নতুন লোক ঢুকতে না দেয়!...না, না, যারা আছে, তাদের চলে যেতে বলবার দরকার নাই!...আপনা থেকেই তারা চলে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। আজকের বরাদ্দ বাজার তো হয়েই গিয়েছে। নতুন করে আজকে তো কিছু কিনতে হবে না তাদের জন্য।...গরুর গাড়ী, ঘোড়া, সাইকেল, সব এখন হাতের মধ্যে রাখা উচিত। মালিক যাওয়া মাত্র ওসব জিনিসগুলোর দরকার পড়বে।...শুধু সরকারী অফিসারদের এখনও ষ্টেশনে যাবার গরু গাড়ী দিতে-ই হবে!...তাঁকে এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নিজে দাঁড়িয়ে এ পর্ব শেষ করে, তবে তাঁর ছুটি। তারপর যাদের জিনিস তারা বুঝে নিক।... এতকাল বিপদ আপদ মাথায় নিয়ে, একনিষ্ঠভাবে মালিকের কাজ যে করে এসেছেন—সে শুধু নৌরঙ্গী চৌবের বুড়ো বাপকে এককালে কথা দিয়েছিলেন বলে। সম্পূর্ণটা অবশ্য প্রভুভক্তি নয়—সে বুড়োর সময়ে নিজের অন্য স্বার্থও জড়িত ছিল না এর সঙ্গে, একথা তিনি হলপ খেয়ে বলতে পারেন না।...ব্যস করো, নাটোয়ার চৌধরী! দানের খাতার হিসাব নিকাশ শেষ করে দাও! সদরের ব্যাঙ্কে, একাউন্ট 'জি'তে, অর্থাৎ দানের খাতার উপর, বলভদ্র উকিলের 'নামে একখানা চেক কাটতে হবে!...তারপর সেখানাকে ভাঙ্গাবার জন্য মোটরবাইকে

লোক পাঠাতে হয়।…কিন্তু অত টাকা নিয়ে বোধ হয় ট্রেণে যাতায়াতই ভাল।…হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, মালিক স্বর্গে গেলে ব্যাঙ্ক টাকা তোলায় ঝঞ্ঝাট বাধাবে।…

গেষ্ট-হাউসের কাছেই দানসাগর পোষ্ট-অফিস। একবার ডাক বিভাগের একজন বড় সাহেব এখানকার গেষ্ট-হাউসে ছিলেন দিন কয়েক। কৃতজ্ঞতায় আর দানের সমারোহ দেখে অভিভূত হয়ে, তিনি নিজে থেকে এখানে পোষ্ট-অফিস স্থাপিত করবার হুকুম দিয়েছিলেন। নামকরণটা পর্যন্ত তাঁর নিজের।…সেই পোষ্ট-অফিস থেকে ডাক নিয়ে এল একজন লোক। অনেকগুলো চিঠি। চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার ম্যানেজার সাহেব সেগুলোর উপর। খানকয়েক পাঠিয়ে দিলেন পাশের ঘরের দপ্তরের মুহুরীর কাছে।…এদের সকলকে আসতে বারণ করে চিঠি লিখে দাও।…না,—না,—না।…ব্যস করোর হুকুম হয়ে গিয়েছে।…এর ডাকখরচটা 'দ' খাতায় টুকে রাখতে হবে। হিসাব শেষ হবার আগে।…হিসাব-নিকাশ করবার পর মালিককে এ সম্বন্ধে খবর দিতে হবে।

সিন্দুক খুলতে যাবেন, তিন নম্বর গেষ্টহাউসের বাবুর্চি এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"হুজৌর"!

চমকে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করলেন ম্যানেজার সাহেব। কি চায় লোকটা?

"হুজুর, তিন নম্বর গেষ্ট-হাউসে বিয়ার ফুরিয়ে গিয়েছে। ডাক্তার-বাবুরা চাচ্ছেন। এক নম্বর গেষ্ট-হাউসের বাবুর্চির কাছ থেকে ধার নিই এখনকার মত?"

"না। মুন্সীজীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সাইকেলে চলে যাও বিয়ার আনতে!"

…ডাক্তারবাবুদের হয়ত আরও দুই তিনদিন থাকতে হবে। ডাক্তারদের খরচ আসবে জেনারেল তহবিল অর্থাৎ জমি জিরেতের

আয় থেকে। আজকের মত দিনে তাঁর মালিকের 'দ'খাতা-সংক্রান্ত- ইচ্ছা, তিনি চুলচেরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। নইলে মালিকের আত্মা স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না। তিনি জানেন যে, এই দিনকার ছোঁয়াচ, 'জেনারেল হিসাবে' না লাগতে দেবার দিকে নওরঙ্গী চৌবের কি রকম সজাগ দৃষ্টি—একেবারে শুচিবাই-এর মত।···

সেরিস্তা-ঘরে গিয়ে নাটোয়ার চৌধরী আমলাদের বলে দিয়ে এলেন, কেউ যাতে নিজের নিজের জায়গা থেকে না ওঠে—কখন কার দরকার পড়বে বলা যায় না।

যাতে কেউ আর তাঁকে এখন অযথা বিরক্ত করতে না আসে, সেইজন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে দানখাতার শেষ হিসাব কষতে বসলেন। মাথার উপর খাঁড়া ঝোলা অবস্থায়ও যিনি জীবনে বিচলিত হননি, আজ তাঁর হাত কাঁপল প্রথম।

ওদিকে নওরঙ্গী চৌবের অসুখ বাড়বার কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে, লোকের মুখে মুখে। নিজের নিজের কাজকর্ম ছেড়ে মেয়ে-পুরুষ সকলে গুটিগুটি এসে দাঁড়াচ্ছে, ভিটে-বাংলার মাঠের চারিদিক-কার বেড়া ঘিরে।···হরবিলাস চৌবেকে বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে দেখে, তারা ততটা আশ্চর্য হয়নি, যতটা হয়েছে চিমটি কাটবার সেবাদাসীদের বাইরে চলে আসতে দেখে। চাঁপিয়ার দলের যে, 'ডেউড়ি'র স্ত্রীলোকদের এখানে আসবার সময় ছাড়া, আর কখনও বেরিয়ে আসবার কথা নয়। তাঁরা এখনও আসেননিতো!···এখনতো শুধু বলভদ্র উকিল রয়েছেন ভিতরে! তাঁর সঙ্গে এত কিসের গোপন কথা; ছেলে পাবে তো কিছু? অবশ্য নগদ যদি কিছু আজও থাকে। সকলের চোখে মুখে প্রশ্ন, কত প্রশ্ন, কত উত্তর। আর এই সব প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ান অনুচ্চারিত এক বিরাট জিজ্ঞাসা। রুগীর নামের সঙ্গে সে প্রশ্ন মিশানো, ভিটেবাংলার প্রাঙ্গনে সে প্রশ্ন ছিটানো, বহুদিনের কৌতূহলের রসে সিঞ্চিত সে প্রশ্ন। রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। অতিথিশালার ভিড়ের সঙ্গে, তাঁর দানসাগর

উপাধির সঙ্গে, তাঁর নাম, যশ, পশার প্রতিপত্তির সঙ্গে এর সম্বন্ধ। দানসাগরের উৎসমুখ সম্বন্ধে তাদের চিরকালের জল্পনা-কল্পনাগুলো আজ হঠাৎ স্পষ্টতর রেখায় আঁকা হয়ে গিয়ে মনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞাতসারে জানতে চাচ্ছে রুগীর বর্তমান অবস্থার কথা, কিন্তু অজানতে হাতড়ে বেড়াচ্ছে অন্য একটা উত্তর।

এ নিয়ে কৌতূহল কি শুধু গ্রামের লোকের? জেলার এমন কোন বয়স্ক ব্যক্তি বোধহয় নাই যে, খোশ-গল্পর আসরে কখনো না কখনো, এ নিয়ে, আলোচনা করে নি। সম্পন্ন গৃহস্থ বলতে যা বোঝায়, নওরঙ্গী চৌবের জোতজমি নিশ্চয়ই তার চাইতে বেশী। জমি ভাল, লাঠির জোর আছে, চাষবাসের কাজে শৃঙ্খলা আছে—সব ঠিক। কিন্তু চাষবাস থেকে আয়ের তো একটা সীমা আছে। কত আর হতে পারে? অন্য সম্পন্ন গৃহস্থের চেয়ে পাঁচগুণ বেশী? দশগুণ? বিশগুণ তার চেয়ে তো বেশী নয়? এই শ্রেণীর এত বিঘা জমি থেকে কত আয় হতে পারে তার একটা আন্দাজ আছে লোকের। তাতে মদ, মোসাহেব, মটরগাড়ীতে খরচ করে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যেতে পারে মাত্র; তার বেশী নয়। কিন্তু দানসাগরের আসল খরচ যে দানে। সে যে হাজার হাজার টাকার ব্যাপার। কেউ যে ফিরে যায় না খালি হাতে। আর দেওয়া মানে বেশ প্রাণভরে দেওয়া। দায়িত্বশীল প্রার্থী বুঝলে তিনি কখনও নিজে থেকে দানের পরিমাণ ঠিক করেন না। আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে শুধু জিজ্ঞাসা করেন—কত দিতে হবে?

দানের নেশা। সত্যিই এ এক অদ্ভুত আসক্তি; অথচ যেন নিরাসক্ত অবহেলায় ছিটিয়ে ফেলা। কোন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হরির লুট লোটানোর কথাটা তবু বোঝা যায়; কিন্তু এ যেন ছেলেপিলের খোলামকুচি ছিটিয়ে খেলা।

এত টাকা আসে কোথা থেকে?

বাপ যদি ধরে নাও, কিছু নগদ টাকা রেখেও গিয়ে থাকেন, কিন্তু যে হারে খরচ তাতে সে টাকা ফুরাতে ক'দিন লাগে?

তবে এত টাকা আসে কোথা থেকে? কোন গোলমেলে ব্যাপার নাইতো এর মধ্যে? নোট জাল করা নয়ত?

এ খালি অজ্ঞ লোকের প্রশ্ন নয়। দানের পরিমাণ সরকারী সি-আই-ডি ডিপার্টমেন্টের নজরে পড়েছিল এক কালে। কিন্তু পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শিকারের জন্য যাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন, তাঁর বিরুদ্ধে কি কোন বুদ্ধিমান পুলিশ কর্মচারী এক কলমও লেখে?

আজও সেই প্রশ্নটা ঠেলে মনের উপর উঠে আসছে এতগুলো মেয়েপুরুষের। বেড়ার চারিদিক দিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা, ভিটেবাংলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বর্তমানের চেয়ে অতীতের কথাই মনে পড়ছে বেশী। সকলের স্মৃতিই যে খুব সুখপ্রদ তা' নয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অনুকূলে, যৌবনে, সম্মুখের ভিটাবাংলায় অন্তত একরাত্রিও কাটায়নি এমন মেয়ে এখানে কম। সেদিনকার ভয় কবে মন থেকে মুছে গিয়েছে; মনে লেগে আছে হয়ত একটু মধুর স্মৃতির রেশ।...কী মিষ্টি করে কথা বলতে পারেন!...কী রকম ভাল ব্যবহার ...ভয় ভাঙ্গানর জন্য কেমন মজার মজার গল্প করতে পারেন। কে বলবে যে এ সেই দোর্দণ্ড-প্রতাপ নওরঙ্গী চৌবে যার ভয়ে সরকারী জরিপের সময়, কোন আধিয়ারের সাহস হয়নি, নিজের অধিকার সম্বন্ধে সত্য কথা বলবার! যে লোকটা থানার দারোগার বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল একবার রাগ করে, সে এত নরম! ··এত উচ্ছৃঙ্খল, অথচ এত সংযত!...

পুরুষদের মনে ক্ষোভ আছে, গ্লানি আছে, অপমানের রেশ হয়ত এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। কিন্তু ওই একটা দুর্বলতা ছাড়া সবই যে গুণ লোকটার। এত স্বেচ্ছাচারী, অথচ এত সহানুভূতি লোকের উপর! অন্ধকার রাত্রিতে যার লাস ভাসিয়ে দিয়ে আসে মাঝগঙ্গায়, তার পরিবারের আজীবন ভরণপোষণের ভার নেয় বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হয়েও। খেয়ালের চাহিদা না মিটলে দুর্বৃত্তেরও অধম; অথচ

'ডেউড়ি'র শিবালয়ে শিবের মাথায় জল না দিয়ে, কিছু মুখে দেয় না। …এত বিশাল যার 'ডেউড়ি' তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়বে কিনা এই ঘুপচী খোলার ঘরে! ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা চৌবেজীর! বিচিত্র খেয়াল! নওরঙ্গী চৌবের বাবাও এই ঘরে মারা গিয়েছিলেন। অদ্ভুত আচরণ এ পরিবারের লোকের! বোম্বাই শহরে নওরঙ্গী চৌবের শরীর খারাপ হ'ল; সেখানে চিকিৎসার কত ভাল ব্যবস্থা; চলে এলেন এই ঘুপচীর ভিতর মরবার জন্য! আগে আর একবারও চলে এসেছিলেন শরীর খারাপ নিয়ে, নৈনীতাল থেকে! এঁর বাবা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ছেলে বড় হবার পর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখতেন-- রাত্রিতেও। নিজের ছেলে হরবিলাসের বেলায় নওরঙ্গী চৌবে কিন্তু এ ব্যবস্থা বজায় রাখেননি। একদিনের জন্যও উনি ছেলেকে ভিটাবাংলায় আসতে দেননি।…কিন্তু কেন থাকে এরা এই খোলার বাড়ীটাকে আঁকড়ে প'ড়? শোনা যায় ওদের নাকি পাকা ছাত সয় না। দেখা যাচ্ছে যে, হরবিলাসের তো পাকা দালানের নীচে রাত কাটানো, বেশ সয়! তবে?…সেও কি বাপ মরলে এই ভিটাবাংলাতে এসেই শোবে রাত্রিতে?…

আরও কত কথা, কত সন্দেহ। তবু আসল প্রশ্নের উত্তর মেলে না।…এত টাকা আসে কোথা থেকে?…

বলভদ্র উকিল তাহলে এতক্ষণে ছুটি পেলেন।…হরবিলাসবাবু আবার রুগীর ঘরে ঢুকলেন।…আজ আর ছেলে, বাপের ঘরে ঢোকবার অনুমতির অপেক্ষা রাখছেন না। বাবার সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলতে পারেন না কোনদিনই--এমনই ছিল সম্বন্ধ আর শিক্ষা। বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবারই নিয়ম। আজ সে নিয়ম ভাঙ্গলেন। কেমন একটা করুণ হাসি রুগীর মুখে।…একটু যেন মৃদু ভর্ৎসনা, না ডাকতেই আসবার জন্য।…আশীর্বাদ করবার জন্য হাত তোলবার একটু যেন ব্যর্থ চেষ্টা।…তোর উপর এ ভূতের বোঝা চাপিয়ে যাব না— যেমন করেছিলেন আমার বাবা।…সে ভুল আর আমি করি!…

"হবে। হবে। পরে। পরে। আর একটু পরে।"...

এখনও যে এ পর্ব শেষ হয়নি। বলভদ্র উকিল তার নির্দেশ পেয়েছে। সে গেল ডেউড়িতে নাটোয়ার চৌধরীর কাছে। সেখানকার কাজ তুজনে মিলে শেষ করে, আবার তারা আসবে এখানে। তাদের বিদায় করে, তারপর তোদের ডাকবো।...

চাঁপিয়া এসে বসল মালিকের গায়ে আরাম করে দিতে। তার সঙ্গিনীরা পর্দার ফাঁক থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে—একটু নতুন ব্যাপার কিনা। আজ মালিকের ছেলে আর চাঁপিয়া তুজনে একই খাটে রুগীর পাশে বসেছে! বাবার ঘরবোঝাই চন্দনকাঠ স্টক করে রাখবার খেয়ালে, আগে ছেলের হাসি আসত . আজ গন্ধটা নাকে আসায় চোখ ছলছল করছে। চাঁপিয়ারও চোখে জল।

আসল খবর জানতে পারা যাচ্ছে না কিছুই। বেড়ার চরিদিকের মেয়েদের মধ্যে অধৈর্য গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বলভদ্র উকিল ডেউড়ির দিকে চলে গেল গাড়ীতে।...লোক ভাল উকিলবাবু।...যে কয়জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে নওরঙ্গী চৌবে তাসের জুয়া খেলতেন সম্মুখের বারান্দায়, তাদের মধ্যে উকিলবাবুকে কতবার দেখেছে এরা। বারান্দার নীচের প্রশস্ত নিকানো জায়গায় এই সব মেয়েরা ক্ষেতের ফসল ঝাড়ে, শুকয়, গোলার ফসল রৌদ্রে দেয়, আবার গোলায় তুলে রাখে। এ কাজে পুরুষ জনমজুর নিযুক্ত করবার রেয়াজ নাই কোনকালে ভিটাবাংলার প্রাঙ্গণে। জুয়ার আসর বসবার দিনগুলোতে আবার বেশী বয়সের স্ত্রীলোকেরা কাজ পেত না। এ নিয়ে মেয়েদের মধ্যে রেসারেষি পড়ে যেত। প্রতি হাত শেষ হবার পর জেতা পয়সা ছিটিয়ে হরিরলুট দিয়ে দেওয়া হত মেয়েদের মধ্যে। কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ির মধ্যে, আড়চোখে বিজুলী খেলবার ধূম লেগে যেত, চৌবেজীর ইয়ার-দোস্তদের খাতিরে।...সে সব দিন কি আবার আসবে!... ডেউড়িতে—মানুষ হরবিলাসবাবু কি আর ভিটেবাংলার এসব পাট রাখবে? সে এত টাকা পাবে কোথায়? হরবিলাসবাবু করছে কি

এতক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে? বাপ বুঝিয়ে দিচ্ছে না তো কি করে যকের ধনের সিন্দুক খুলতে হয়?…না না তা' কি করে হবে; চাঁপিয়া যে রয়েছে ঘরের ভিতর।…ওটাকে ঘর থেকে বার করে দিলেইতো পারে! ওটা কি আর এখন ঘর থেকে নড়বে? চালাক আছে।… দেখা যাক কত দিয়ে যায় ওকে!…ওই নাটোয়ার চৌধরী থাকতে সেটি হবার জো নাই! সে গুড়ে বালি!…এত টাকা আসে কোথা থেকে?…

আর ওদিকে ডেউড়ির অফিসঘরে ম্যানেজার সাহেব আর বলভদ্র উকিল দরজা বন্ধ করে এতক্ষণ ধরে এত কি গোপন আলোচনা করছেন, তা' নিয়ে আমলা মহলে জল্পনাকল্পনার শেষ নাই।…কোন গণ্ডগোলের ব্যাপার নিশ্চয়ই!…মালিককে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিল না তো?… হরবিলাসবাবুর বিরুদ্ধে কোন ফন্দিফিকির নাইতো?…ম্যানেজার সাহেব সে রকম ধরণের লোক না তো! ম্যানেজার সাহেবের উপর হরবিলাসবাবু আর তাঁর মা বেশ বিরক্ত, মালিককে হাতের মুঠোয় এনে এত টাকা দান খাতায় খরচ করিয়ে দেয় বলে। মালিক গেলে, আর কি হরবিলাসবাবু ম্যানেজার সাহেবকে রাখবে চাকরিতে?… তখন বোঝা যাবে এত টাকা আসত কোথা থেকে।…কি করে যে মালিককে জাদু করেছে নাটোয়ার চৌধরী!…

বন্ধ ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে অন্দরমহলের দাই জানিয়ে গেল- বুড়িমা বলছেন, গেষ্টহাউসে বসে বসে ডাক্তারগুলো করছে কি? মালিক যদি তাদের ঘরে ঢুকতে বারণও করেন, তাহলেও তো তা'রা ভিটাবাংলার বারান্দায় বসে থাকতে পারে। রুগীর কাছাকাছি থাকাটাই কি উচিত না?…অন্দরমহলের কথার জবাবে বিরক্তি প্রকাশ করবার সাহস নাটোয়ার চৌধরীর নাই। দরজা খুললেন না; শুধু বললেন—"আচ্ছা"।

আমলাদের চোখে চোখে খেলে গেল —"এত কিসের কাজ?"

দরজা খুলল ঘণ্টা দুয়েক পর। দোতলার জানালা থেকে কয়েক

জোড়া ব্যথাতুর চোখের দৃষ্টি গিয়ে থামল নীচের মোটরগাড়ীখানার উপর।

...এরাতো দেখি নিজেরাই আবার ভিটাবাংলায় চলল! কাজ না ছাই!...বোধ হয় বাড়ীর মেয়েদের যেতে দেবে না ঠিক করেছে। এরকম সময়েও রেহাই দেবে না নাটোয়ার চৌধরী!...জোর করে তাঁরা চলে যেতে পারেন ভিটাবাংলায়। নাটোয়ার চৌধরী যদি গাড়ী নাও দেয় তাহলে তাঁরা হেঁটেও বেরিয়ে পড়তে পারেন।...কিন্তু মালিক যদি চটেন তাঁদের যেতে দেখে!...সে সাহস, সে অধিকার, সে দাবি এ বাড়ীর মেয়েদের নাই। ব্যর্থ, অব্যক্ত আক্রোশ চোখের জল ছাড়া আর অন্য কোন পথ পাচ্ছে না বার হবার।

ভিটাবাংলার বেড়ার চারিদিকের মেয়েপুরুষে সরে দাঁড়িয়ে, পথ করে দিল ম্যানেজার সাহেব আর বলভদ্র উকিলকে, ভিতরে ঢোকবার!

...অ্যাঁ! এটা আবার কে? ভিড় ঠেলে ঢুকল ভিতরে? ছুটছে! জুমরাতিয়ার মা না? হাতে একটা ডাব!

"ম্যানেজার সাহেব! ম্যানেজার সাহেব!"

বারান্দায় ওঠবার সিঁড়িতে তুজনে থমকে দাঁড়ালেন।

এত সাহস কোথা থেকে পেল বুড়িটা!...

শঙ্কাকাতর মিনতি জুমরাতিয়ার মায়ের।...দানসাগরের নামে বাঁজা গাছে ফল ধরে।...এ অঞ্চলে নারকেল গাছ বিরল। উঠনে লাগানো নারকেল গাছে ফল ফললে প্রথম ফল মানত করা ছিল দানসাগরের নামে। ভেবেছিল তিনি ভাল হলে দেবে।...কিন্তু... কিন্তু...

হাউ হাউ করে কাঁদছে সে।...

এখন কি রুগীর ডাব খাবার সময়? তবু নাটোয়ার চৌধরী ডাবটা নিলেন বুড়ির হাত থেকে!

কই এঁরা তুজন ঢুকতে হরবিলাসবাবু বেরুলেন না তো! চাঁপিয়াও থাকল ভিতরে। বাড়ির লোক আর ডাক্তার বদ্যি, এদেরইতো এখন

রুগীর কাছে থাকবার সময়; কিন্তু থাকছে যত বাইরের লোক!… ভিটাবাংলার সবই অদ্ভুত! বোঝা যায় না কিছুই।

…কিসের এত কথা? কেন এত আনাগোনা? কী রে? কখন রে? কাকে রে? অসংখ্য ছোট ছোট প্রশ্নের অফুরন্ত স্রোত অজানতে এগিয়ে চলেছে দানসাগরের একটা মনের-মত উৎসমুখের সন্ধানে।

নাটোয়ার চৌধরী একবার বাইরে এসে জুমরাতিয়ার মাকে জানিয়ে গেলেন যে, মালিক তার ডাবের জল খেয়েছেন, আর সেই খবরটা তাকে জানিয়ে দিতে বলেছেন। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে বুড়িটা। জুমরাতিয়া তাকে ধরে বাইরে নিয়ে এল।

…কোথাকার কোন এক বুড়ির উপর যাঁর এত দরদ তাঁর কি এখনও একবার, নিজের আত্মীয় পরিজনদের কথা মনে পড়ছে না?…

…মনে পড়বে না কেন—হরবিলাস, পড়ছে। সবুর!…আগের কাজ আগে।…যা করছি এও তোমাদেরই জন্য! এর ছোঁয়াচ লাগাতে দিতে চাই না তোমাদের গায়ে। আমার সঙ্গে সঙ্গে এ শেষ হয়ে যাক!…

বাবার চোখের হঠাৎ আসা স্নেহকোমল ব্যঞ্জনাটুকু আরও কত কি বলছে ছেলেকে।

তাঁর মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে তাঁর কথা বুঝতে চেষ্টা করছেন ম্যানেজার সাহেব। ফিসফিস করে বলা কথা; তাই তার ঠোঁটের কাঁপনের উপর নজর রেখেছেন বলভদ্র উকিল।

চাঁপিয়া আর হরবিলাসবাবু কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছেন কথাগুলো। তাদের চেয়ে বেশী বুঝতে পারছেন বলভদ্র উকিল। কথার সবটুকু বুঝছেন শুধু নাটোয়ার চৌধরী।

চাঁপিয়া আর হরবিলাসের সম্মুখে একটু বাধোবাধো ঠেকায়, ম্যানেজার সাহেব মালিকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

"...হ্যাঁ হুজুর।...সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।...যেমন যেমন বলেছিলেন।...কিছু চিন্তা করবেন না আপনি।...আমি আছি কিসের জন্য।...হ্যাঁ গিয়েছে।...হ্যাঁ হয়েছে।...ওটাও হয়েছে।...একেবারে আলাদা রাখা হয়েছে ও হিসাব।...বলভদ্রবাবু এখনই যাচ্ছেন সদরে।...ওঁকে সব বুঝিয়ে দেওয়া আছে। কাল কাজ সেরে ফিরে আসবেন হুজুরকে খবর দিতে। এবার তাহলে আমরা যাই? বাড়ির লোকদের পাঠিয়ে দেইগে?...

"দাঁড়াও!"

এরপর ম্যানেজার সাহেব আর কোন কথা বলেননি। বলেছেন মালিক। দরকারী কথা। অন্তিম নির্দেশ। নিজের সম্বন্ধে। শুনতে বাধ্য সকলে।..."গঙ্গাতীরে না।...এই বারান্দায়। ঘরভরা চন্দনকাঠ। আরও অন্য কাঠ। প্রচুর। প্রচুর ঘি। বাড়ীটা পুড়ে যাক। মরবার দুঘণ্টার মধ্যে!...ব্যস!"

বোঝা গেল ছেলের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেলেন ম্যানেজার সাহেবকে—যাতে পরে এ সম্বন্ধে বাড়ির অন্য লোকদের ওজর-আপত্তি না টেকে।

চারজনের চোখেই জল।

বলভদ্র উকিল আর নাটোয়ার চৌধরী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে চড়লেন। তারপর বেরুল চাঁপিয়া।

চাঁপিয়াকে বেরুতে দেখেই বেড়ার ধারের লোকরা বুঝে গিয়েছে যে এইবার মায়েরা আসছেন।...ঠিকই তাই; সিঁড়ির কাছ থেকে ঘর পর্যন্ত যাবার জায়গাটা কানাত দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হল। আর আশা বুঝি নাই!...মেয়েরা সব ঘিরে ধরেছে চাঁপিয়াকে— সঠিক খবর পাবার জন্য।

হ্যাঁরে চাঁপিয়া ফটোগেরাপের ঘরের মধ্যে যকের ধনের সিন্দুক আছে নাকিরে? একদিন উঁকি মেরে দেখলিনা কেন? তোর কি মনে হয়—এত টাকা কোথা থেকে আসতোরে?

'আসে' না—আসতো। অতীতকাল। আর কেউ ভুলেও নওরঙ্গী চৌবে বলবে না—বলবে দানসাগর।

চাঁপিয়ার দল বেরিয়ে এসেছে, আর বাড়ীর মেয়েরা ঢুকেছেন ভিটাবাংলায়। ভিটাবাংলার স্মৃতি-বর্ণালীর উগ্র রঙগুলো মুহূর্তের মধ্যে মুছে গিয়েছে মন থেকে।—অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে এর চোখঝলসানো জলুস। এক শান্ত জ্যোতির্মণ্ডলের কোমল সোনালী দ্যুতি ভিটাবাংলাকে ঘিরে। কারও মুখে কথা নাই। ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চাঁপিয়া কত পেল সে কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছে মেয়েরা তাকে। মুহূর্তের মধ্যে রহস্যের একটা সমাধান, কি করে যেন এতগুলি মনকে নিজের আওতায় টেনে নিয়েছে। নাটোয়ার চৌধরীর হুকুমে একদল মজুর এখানকার গোলাগুলো থেকে ফসল সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। পুরুষ মানুষে আজ প্রথম এখানকার গোলার কাজে হাত দিয়েছে; তবু মেয়েরা অবাক হল না। যেন এইটাই এখানকার চিরাচরিত প্রথা।

'ব্যস করো'—সংক্রান্ত কাজ শেষ হয়েছে নাটোয়ার চৌধরীর। তবু কাজের বোঝা তাঁর মাথা থেকে নামেনি এখনও। মালিক যে হুকুম দিয়েছেন, মারা যাবার দু ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ করতে হবে! কত কাজ! সময় নাই তাঁর মোটে। "মোতি সিং! কলাইএর বস্তাগুলোকে গাড়ী থেকে নামিয়ে রাখাও এক নম্বর গেস্টহাউসে!"

স্টেশনে যাবার পথে বলভদ্র উকিল আনমনা হয়ে পড়েছেন। ভিটাবাংলার চন্দনের গন্ধটা যেন এখনও নাকে এসে লাগছে।···উকিল মানুষ। বহু রকম লোকের সংস্পর্শে তাঁকে প্রত্যহ আসতে হয়; কিন্তু এমন বিচিত্র খেয়ালের লোকের সান্নিধ্য তিনি আর কখনও পাননি। অদ্ভুত বিবেক নওরঙ্গী চৌবের! দান-খয়রাতের তহবিলে যত খরচ হয়, সেই আয়ের উপর প্রাপ্য সরকারী ট্যাক্স সে কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে চায়। বিবেক পরিষ্কার রাখবার এই টাকাটা, নাম না জানিয়ে যথাস্থানে পাঠানর ভার তাঁর উপর।

....ছোটবেলায় মাত্র কিছুদিন দুজন এক সঙ্গে পড়েছিলেন। তারপর ওর বাপ, ওকে পাঠিয়ে দেয় বোম্বাইতে ভাল করে ফোটোগ্রাফি শিখবার জন্য। বন্ধু হিসাবে নওরঙ্গী চৌবে তাঁকে যে এতকাল মনে করে রেখেছে, সেই ঢের। ওকালতি জীবনে—সামান্য কাজের জন্য কম টাকা পাননি তিনি বন্ধুর কাছ থেকে।...

কিন্তু এত টাকা কোথা থেকে আসত?

তিনিও সঠিক জানেন না। কোনদিন এ কথা জিজ্ঞাসা করেননি বন্ধুকে। শুধু এইটুকু বুঝেছেন যে দানসাগরের স্রোতের উৎসমুখ গোপনে রাখবার জিনিস। উকিলের মনে, তাই মনে হয়েছে যে ভিটেবাংলার ফোটোগ্রাফির ঘরের সঙ্গে, এর হয়ত সম্বন্ধ থাকতে পারে। নওরঙ্গী চৌবের বাবাও শোনা যায় ওই ঘরে রাত্রেতে জপতপ করতেন।...কাল যখন তিনি রাতের ট্রেণে আবার ফিরবেন, তখন হয়ত স্টেশনেই খবর পাবেন যে একটু দেরী করে ফেলেছেন তিনি আসতে। ...স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে দূরে অন্ধকারে তাকালে দেখবেন ভিটে-বাংলার দিকের আকাশ হয়ত লাল হয়ে গিয়েছে। দূর থেকে বাঁশ ফাটার শব্দ কানে আসছে। আগুনের হলকা সত্ত্বেও অগণিত লোক হয়ত চাপ বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে ভিটেবাংলার চারিদিকের বাঁশের বেড়া ঘিরে।...নীরব, শোকান্বিত, শ্রদ্ধাবনত, মোহাবিষ্ট।...ধোঁয়ার সুবাস, আগুনের উত্তাপ, আর মনের আবেশের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে একটি নূতন কিংবদন্তীর বীজকণা। একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের শিখার দিকে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে দেখবে, লাল-চেলি-পরা এক নারী-মূর্তিকে, ধোঁয়ার কুণ্ডলির উপর ভর দিয়ে, আকাশের দিকে চলে যেতে!... আগুন নিভলে পুরুষরা এই ছাই আঁজলা ভরে ভরে নেবে; মেয়েরা নেবে আঁচলে বেঁধে; মায়েরা ঠেকাবে ছেলের কপালে!....'এত টাকা কোথা থেকে আসত?'—এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছে তারা।....

উঁচুনীচু রাস্তায় একটা হঠাৎ ঝাঁকুনিতে গরুর গাড়ীর পৈরের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল বলভদ্র উকিলের।

পূতিগন্ধ

প্রথম জানতে পেরেই মৃণালিনী রিনির নাক আর মুখ খাম্‌চে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে নেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে, দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে মেয়ের দুই গাল টেনে ছিঁড়ে ফেলবার যোগাড় করেছিলেন। নরম চামড়ার উপর নখ বসে গিয়েছিল। কামড়াবার কথাটা মনে পড়েনি। রান্নাঘরের দেয়ালে মেয়ের মাথা ঠুকে দিয়েই শোবার ঘরের দিকে ভয়ে তাকিয়েছিলেন—অন্য ছেলেমেয়েরা শুনে ফেলল বুঝি শব্দটা। এরই ভয়ে চড়চাপড় মারেননি, চেঁচিয়ে গালাগালি দেননি, হাউ-হাউ করে কাঁদেননি। মেয়েটাও কাঁদেনি ; ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'এখন আমি কি করি এই মেয়েকে নিয়ে।' কপালকে অভিশাপ দেবার এই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী। ভয়-পাওয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলা। কিছু ভেবে বলা নয় : আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাটা।

বিপদে দিশেহারা হবার মেয়ে তিনি নন। আপদ-বিপদ তাঁর চিরদিনের সাথী। ওই তো স্বামী। সংসারের ঝড়ঝাপটা সামলাবার ভার যে তাঁর একার সে কথা মৃণালিনী জানেন। অভাবের সংসার। কাজেই বিপদ-আপদেরও অভাব নাই। একা সামলাতে সামলাতে এখন নিজের উপর একটা বিশ্বাস এসে গিয়েছে।

...বিপদ আসে, আবার কেটেও যায়। ভগবান আছেন! কিন্তু এ বিপদটা যে অন্য রকমের! এর কথা যে বলা যায় না কারও কাছে। বলা যায় এক শুধু রিনির বাবার কাছে, কিন্তু সেখানে বলাও যা, না বলাও তাই! শুনে হ্যাঁও বলবে না, না-ও বলবে না—মুখের কথার যে দাম আছে—ছাতাটা নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে যাবে! ছেলেমেয়েরা যে আমার একার—তার তো নয়।...মাইনের

পঁচাশি টাকা মাস পয়লা এনে হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া, আর কোন সম্বন্ধ নাই এ সংসারের সঙ্গে! বাড়ীর কেউ অসুখ হয়ে মরল কিনা, আজকে হাঁড়ি চড়ল কিনা—কোন কিছু জানবার প্রয়োজন নাই। শুধু নিজের দরকারের জিনিসগুলো হাতের কাছে পাওয়া চাই। তা হলেই হল!...আর এ বিষয়টাতে তো সে আরও বেশী চুপ করে থাকবে। মুখ ফুটে বলবে না, কিন্তু চুপ করে থেকে বুঝিয়ে দেবে যে, গানের মাষ্টার নিতাইকে রেখেছিলে যখন তুমি, তখন এ বিষয়ে দায়িত্বও তোমার; যা উচিত বোঝ কর।...এই কি বাড়ীর কর্তার উপযুক্ত কথা?...

এর জবাব ইচ্ছা করলে মৃণালিনীও দিতে পারেন। গানের মাষ্টারকে প্রথম এ বাড়ীতে ধরে এনেছিলেন বাড়ীর কর্তা নিজে। কীর্তন শোনবার জন্য। মৃণালিনীর স্বামী প্রতি অমাবস্যার রাত্রিটা কালীবাড়ীতে কাটান। বলেন তো পূজা করতে যান; কি করেন তিনিই জানেন: তাঁর একটা কথাও মৃণালিনী বিশ্বাস করেন না। কালীবাড়ী থেকেই নিতাইকে ধরে এনে বলেছিলেন—চাকরির চেষ্টায় এখানে নতুন এসেছে ছেলেটা। চমৎকার গান গায়। ভাল ছেলে। চাকরির জন্য ধরেছে। পেন্সনের মুখে সাহেবকে বললে সাহেব কি সে অনুরোধ ঠেলতে পারবেন! হয়েই যাবে একটা ছোটখাটো চাকরি।

স্ত্রীর ধারণা স্বামী নিতাই-এর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন সাহেবকে ঘুষ খাওয়াবার নাম করে।

...তোমাকে চিনতে তো আমার বাকি নেই। নইলে ছোঁড়াটা অমন করে আঁকড়ে তোমাকে ধরবেই বা কেন? তুমিই বা তাকে বাড়ীতে খাতির করে এনে চা খাওয়াতে যাবে কেন? কোন কাজ তো তুমি সোজা করে করতে জান না; সব নাক ঘুরিয়ে। ভাবো অন্য সবাই বোকা।...কি ভেবে কি করেছ তা তুমিই জান। আমি পরের বাড়ীর মেয়ে—আমার কাছে বাড়ীর কোন কথা বলতে তোমার কোষ্ঠীতে বাধে। আমার দোষের মধ্যে, আমি ভাবলাম—মেয়েটাকে

স্কুলেও দিলে না, লেখাপড়াও শেখালে না; যদি একটু গান-বাজনা শেখে তাহলে হয়ত বিয়ের বাজারে একটু সুবিধা হতে পারে।…সেসব করতে তো হবে আমাকেই! আর পেন্সনের সময় তো কবে হয়ে গিয়েছে—দয়া করে এখনও চাকরিতে রেখেছে—তাই!

রিনির পর আরও তিনটি মেয়ে আছে যে! আর রিনির দিদি রাধাকেই বা বাদ দিই কি করে। নাই বা হল সে নিজের পেটের মেয়ে, থাকলই বা সে তার চাকরে দাদাদের কাছে, তবু এখানে পাড়ার লোকে আমাকে যে রাধার মা বলেই ডাকে। রাধার বিয়ের চেষ্টাই তো আগে করা উচিত।…

চেষ্টা করেওছিলেন মৃণালিনী। স্বামীকে কত খুঁচিয়েছেন এ নিয়ে। রাধার দাদারা কতবার বাবাকে চিঠি দিয়েছে বোনের বিয়ের সম্বন্ধে। বোনের বিয়ের খরচ তারাই দেবে; তারাই পাত্রের সন্ধান দেবে; তারাই সব করবে; বাবাকে শুধু সঙ্গে থাকতে বলে। তারা চেনে তো তাদের বাবাকে। হয়ত মেয়ের বিয়ের সময় যাবেই না। পাত্রের খোঁজ করতে বেরুলে বরপক্ষ মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করে। মেয়ের বাপ যদি চিঠিখানা পর্যন্ত না দেয় বরপক্ষকে তাহলে কি কেউ চায় সে রকম বাড়ীর মেয়ে নিতে?

…মাঝ থেকে নিমিত্তের ভাগী হলাম আমি! ছেলেরা বিশ্বাস করবে না হয়ত, কিন্তু ভগবান সাক্ষী, আমি কতদিন তাদের বাবাকে রাধার বিয়ের খোঁজে বেরুতে বলেছি। বাবা গায়ে মাখে তবেতো। ছাতাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া হল রাজকার্যে! ওই এক ধরণের মানুষ! হচ্ছে হবে—না হলেই বা কি আসে যায় এমনি একটা ভাব। আর আমি যে খুব দায়-সারা ভাবে তাগিদ দিয়েছি তা-ও না। আমারও স্বার্থ ছিল যে। রাধার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তো রিনির বিয়ের কথাটা তুলতে পারি না তাদের বাপের কাছে। কালেক্টর সাহেবের নাজির তাদের বাপ। চাকরিতে থাকতে থাকতে রিনির বিয়েটা কোন রকমে দিয়ে দিতে পারলে সুবিধা হত। লোকজন,

আরদালী, চাপরাসী, দইটা মাছটা সব নাজিরের হাতের মধ্যে। কিন্তু পেন্সন নেবার পর আগেকার নাজিরকে কে পুছবে! আর পাড়াপড়শীর মধ্যে যে সুনাম! পাড়ার কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনদিন মেলামেশা আছে রিনির বাবার! ভিন-পাড়ার যত সব ছোটলোকদের সঙ্গে মেলামেশা চলাফেরা। পাড়ার লোকে কত কি কানাঘুষো করে—কানে তো সবই আসে।···

সেই মানুষের কাছেই বলতে হল মুখপুড়ী রিনির এখনকার বিপদের কথাটা। সন্ধ্যার সময় নাজিরবাবু অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন। এসে মুখে কিছু পড়ল, কি না পড়ল, তখনি বাড়ী থেকে বেরুন চাই। কারও কোন কথা শোনবার ফুরসত তখন তাঁর থাকে না। তবু মৃণালিনী এক মুহূর্তও দেরি করতে চাননি এ রকম ব্যাপারে। এমন একটা খবর নিজের মেয়ের সম্বন্ধে; কিন্তু নাজিরবাবুর মুখ দেখে বোঝা গেল না তিনি রাগ করলেন, আশ্চর্য হলেন বা দুঃখ পেলেন হঠাৎ কথাটা শুনে। স্ত্রী বলছেন তখনই গানের মাষ্টারকে গিয়ে ধরতে —আর ভাল কথা বলে হ'ক, কেঁদেকেটে হ'ক, মারধর করে হ'ক, ভয় দেখিয়ে হ'ক, যেমন করে হ'ক, রিনির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিতে। রিনির বাবা শুধু বললেন, 'দেখা যাক।' তারপর ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় বেরুনো; আকাশে মেঘ নাই; তবু ছাতা নেওয়া তাঁর চাই-ই-চাই। ছাতাটা মৃণালিনীর দু চক্ষের বিষ! শীতের সময় বাঁদুরে টুপি, ফাগুন-চোতে সূতীর চাদর, অন্য সময় ছাতা—এ না হলে নাজিরবাবুর চলে না। লোকে বলে সময়ে অসময়ে মুখ লুকোবার দরকার পড়লে, এ জিনিসগুলো কাজে দেয়। সত্য কি মিথ্যা ভগবান জানেন। তবে পাড়ার শুভাকাঙ্খিণীদের দৌলতে এই খবরটা মৃণালিনীরও অজানা নয়।

···'দেখা যাক।' কথার ধরণ দেখ! দেখবে যা সে তো জানা! বাড়ীর অন্য সব জিনিসও যে রকম দেখছ, এটাকেও সেই রকমই দেখবে! এমন লোক সন্তানের বাপ হয় কেন?

যাক, নিতাইকে ডাকিয়ে আনতে, হয়নি। অন্য দিনের মত সন্ধ্যাবেলায় নিজে থেকেই এসেছিল। তাকে যতটা খারাপ ভাবতেন, ততটা খারাপ লোক সে নয়। কান্নাকাটি করে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে রাজী হয়ে গিয়েছিল।

—'যেদিন বলবেন সেই দিনই। আমি নিজেই দুই-একদিনের মধ্যে কথাটা বলব মনে করছিলাম রিনার বাবার কাছে।'

সম্ভব হলে উচিত ছিল সেই রাত্রিতেই বিয়ে দেওয়া; কিন্তু সব উচিত কাজ কি করতে পারা যায়? নানান দিককার নানান জিনিসের কথা ভেবে, তবে কাজ করতে হয়। লোকের নজরে যত কম পড়ে, ততই ভাল। পাঁজি দেখা হয়। ভাগ্যক্রমে ছয়দিন পরে শ্রাবণ মাসের মধ্যেই দিন ছিল। ঠিক হয়ে গেল বিয়ে। সমস্যা কি শুধু একটা। পাড়ার লোকের কত রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, কিন্তু সব চেয়ে বড় জবাবদিহি রাধার কাছে, আর রাধার দাদাদের কাছে। রিনির বাবা স্ত্রীকে বলেন,—'দরকার কি তাদের খবর দিয়ে?'

দরকার তাদের, না দরকার আমার। সতীনপোরা কোনদিন ভাল ব্যবহারও করেনি, মন্দ ব্যবহারও করেনি আমার সঙ্গে। ওই এক রকম আল্‌গা আল্‌গা এড়িয়ে এড়িয়ে থাকা। মনের মিল না থাকুক, লোক-দেখান বাইরের সৌষ্ঠব খানিকটা রাখতে হয়ই, এ সংসারে থাকতে গেলে। রাধাকে আসতে লেখা যায় না তার ছোট বোনের বিয়েতে। তবে তার দাদাদের আসতে লিখতেই হয়। চিঠি পেয়ে নিশ্চয় তারা চটে উঠবে। তাদের সাহোদর বোন বড়; সে রইল পড়ে; তার বিয়ের খোঁজে বাপ একখান চিঠি লিখে পর্যন্ত উপকার করে না; আর তাদের ছোট বোনের বিয়ের উদ্যোগ সাত তাড়াতাড়ি করছে সৎমা'র কথায়। আমার হাতে লেখা চিঠি পেলে তো চটবে আরও বেশী।...

তাই মৃণালিনী স্বামীকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলেন ছেলেদের। তিনি জানতেন ছেলেরা আসবে না এ বিয়েতে। তবে মনের মধ্যে

ক্ষীণ আশা ছিল যে, রিনিকে দেবার জন্য কিছু টাকা বোধ হয় পাঠিয়ে দেবে। ছয়দিন পরে বিয়ের দিন স্থির করবার কারণগুলোর মধ্যে এটাও একটা ছিল।

মেয়ের বিয়ে দিতে সবাই সময় চায়। যোগাড়-যাগাড়, কেনা-কাটা, আনা-নেওয়া, কত রকমের কত কিছু আছে তো! এ ছাই-এর বিয়েতে হাতের ছয় দিনের সময় যেন কাটতে চায় না। ছোঁড়াটা ছ' দিনের সময় পেয়ে আবার না পালায় এরই মধ্যে। মত বদলাতে কতক্ষণ! আর সুপরামর্শ দেবার লোকেরও অভাব হবে না পাড়ায়। চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানকে বলি—হে ভগবান ও যেন না পালায়! কোন রকমে বিয়েটা নমো নমো করে হয়ে গেলে, গলার কাঁটা নামে। কাঁটা বলে কাঁটা! একমাত্র ভরসা যে চাকরি পাবার লোভে যদি না পালায়। নিতাই বলে তো 'যে তার মা, বাবা আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। তিনকুলে কেউ নাই এমন লোকও হয় নাকি পৃথিবীতে। কে জানে!…

'এখন তো নিতাই আমাদেরই হয়ে গেল। এবার সত্যি করে চেষ্টা কর ওর চাকরির জন্য।'

'সত্যি করে' কথাটা মুখ থেকে অসংযত মুহূর্তে বেরিয়ে যেতেই ভয়ে কেঁপে উঠেছে তাঁর বুক। স্বামীর কাছে স্পষ্ট কথা বলবার সাহস তিনি কোনদিন পাননি। গরীব বিধবার মেয়ে তিনি। দোজবরে বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পেরে বিধবা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই প্রথম দিন থেকেই অত বড় চেহারার গম্ভীর প্রকৃতির প্রৌঢ় লোকটির সঙ্গে মৃণালিনীর যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, সেটা ভয়ের।

স্বামী বলেন,—'দেখা যাক।'

তবু ভাল যে চটে ওঠেননি।

বাড়ীর কর্তার কাছ থেকে রিনির বিয়ের জন্য এক টাকাও যে পাওয়া যাবে না একথা মৃণালিনীর জানা। ধার রিনির বাবাকে কেউ

দেবে না—এমনই তাঁর সুনাম বাজারে। পাড়ার লোকে আর অফিসের আরদালীদের মুখে শোনা যে নাজিরের চাকরিতে উপরি রোজগার বেশ আছে। আছে ঠিকই ; কিন্তু মাইনের, পঁচাশি টাকার অতিরিক্ত এক পয়সাও স্ত্রী কখনও স্বামীর কাছ থেকে পাননি। উপরি রোজগারের টাকা কিসে খরচ করেন তিনিই জানেন। সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস কোনদিন মৃণালিনীর হয়নি। এখন দরকার টাকার। যতই সংক্ষেপে সারবার চেষ্টা কর, কিছু খরচ তো করতেই হয় বিয়েতে। মেয়ে জামাইকে কিছু না দিলে কি চলে ? তাঁর সম্বলের মধ্যে আছে দুখান গয়না। একটা বিছে হার আর একজোড়া বালা। বেশ ভারী। বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া। অতি সাবধানে এতদিন বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সে দুটোকে স্বামীর হাতে দিয়ে, বিক্রী করে দিতে বললেন। নাজিরবাবু গয়না দুটোকে পকেটে পুরে ছাতা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ভাল লাগে না তাঁর এত সব বাড়ীর ঝামেলা।

সতীনের ব্যবহার করা জিনিস গয়না দুটো। এতকাল সঙ্কল্প ছিল এই দিয়ে রাধার বিয়ের সময় গয়না গড়িয়ে দেবো—তার মায়েরই জিনিস। লোকে যা সংকল্প করে তা কি রাখতে পারে! এ তো আবার আমার মত মানুষ নিয়ে কথা! যখন যা ভেবে রেখেছি, ঠিক তার উল্টোটি হয়েছে ; যা ধরেছি ফস্‌কে গিয়েছে! সারা জীবন একই রকম গেল। দেখে দেখে আজকাল কোন বিষয় আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখা ছেড়ে দিয়েছি। আমার মত অবস্থার লোকের ওসব বাড়াবাড়ি সাজে না। কত পাপই যে করেছিলাম আগের জন্মে! রাধার তবু দাদারা আছে। রিনির কে আছে, দেবার মত ? সবাই থেকেও কেউ নাই! এখন এই গয়না বিক্রীর টাকাটাও হাতে পেলে হয়। কিছু বিশ্বাস নাই রিনির বাবাকে! আর এদিকে, পাড়ার লোকে তো জ্বালাতন করে খেল। রসিয়ে রসিয়ে, বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কত রকমের যে কথা জিজ্ঞাসা করছে। হঠাৎ বিয়ে?

বড় তাড়াতাড়ি বিয়ে? রেজিস্টারী করে বিয়ে নাকি? বড় আনন্দের কথা, আজকাল তো এরকম হয়েইছে। রাধা আসবে না? বিয়ের পর মেয়ে জামাই এখানেই থাকবে নাকি রাধার মা? আরও কত কথা। যত পার বলে যাও। কানে গুঁজেছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো। গায়ে মাখি না। বুঝেও বুঝি না। ন্যাকা ন্যাকা প্রশ্নের ন্যাকা ন্যাকা উত্তর দিই। তারা মুচকে হাসলে, হো হো করে হেসে সায় দিই।...

যাক, –বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেল। নিতাই পালায়নি। গয়না-বেচা টাকাটা যতদূর সম্ভব পুরোই হাতে এসেছিল। সবই ভগবানের আশীর্বাদ। ভরা শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিটা পর্যন্ত হয়নি সেদিন। শুধু একটা বিষয়ে একটু গোলমাল হয়ে গেল। ছেলেরা আসেনি। টাকা পাঠায়নি। চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি। বাপ আর ছেলেদের মধ্যের চাপা মনোমালিন্যটা একটু পাকাপাকি গোছের হয়ে গেল এই থেকে। তারা জীবনে আর কখন চিঠি দেবে কিনা এ সম্বন্ধে মৃণালিনীর সন্দেহ আছে। বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হবার সময় থেকে ভবিষ্যতের ভয়টা তাঁর বেশ প্রবল। নিজের এতগুলি ছেলেমেয়ে। দুঃসময়ের ভরসা ছিল সতীনপোরা এতদিন পর্যন্ত। কিন্তু সে সব শেষ হয়ে গেল ওই মুখপুড়ী রিনিটার জন্য।

স্ত্রীর অনুরোধে বাড়ীর কর্তা অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলেন বিয়ের দিন। কিন্তু বিকাল বেলায় স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করে যথারীতি বেরিয়েছিলেন ছাতা হাতে নিয়ে। স্ত্রী বলেছিলেন, মেয়ের বিয়ের দিন উপোস করতে হয় বাপকে, সম্প্রদানের সময় পর্যন্ত। শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন,—'ওটাকে যা ভাবছ তা' নয়। ওটা ওষুধ। ভিটামিন। ডাক্তারে খেতে বলেছে।'

মেয়ের বিয়ের খাতিরে সেদিন ফিরেছিলেন একটু তাড়াতাড়ি। আর পকেটে নেড়ে বিস্কুট ছিল না।

মৃণালিনী যখন এখানে এসেছিলেন, তখন বুঝতে পারতেন না স্বামীর মুখের ওই টিঞ্চার আইডিনের মত গন্ধটা কিসের। রাতে

বাড়ী ফিরবার সময় তাঁর কুড়মুড় কুড়মুড় করে ঝাল নেড়ে বিস্কুট চিবানোর অভ্যাসও উনি সেই সময় থেকে দেখে আসছেন। পরে আন্দাজে বুঝেছিলেন যে, ঝাল বিস্কুট চিবুলে জিভের সাড় ফিরে আসে, আর বোধ হয় মুখের গন্ধটাও একটু কমে। জামার পকেটের উদ্বৃত্ত ঝাল বিস্কুটগুলো ছিল উপরি পাওনা মৃণালিনীর সংসারের দিক থেকে। এরই লোভে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যা রাত্রে না ঘুমিয়ে, উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করত বাবার বাড়ী ফেরবার। এই সময়টুকুতেই শুধু তাদের মনে পড়ত বাবার কথা। বাবার কিন্তু এ সময় কারও কথা মনে রাখবার মত অবস্থা থাকত না।

অফিস কামাই কিছুতেই করতে চাইতেন না নাজিরবাবু। জ্বর গায়েও তাঁকে কতদিন অফিস যেতে দেখেছেন মৃণালিনী। বলতেন, তিনি না গেলে নাকি অফিস অচল। স্ত্রীর ধারণা ছিল যে, উপরি পাওনার লোভেই তিনি অসুখ করলেও অফিসে যান। তাই রিনির বিয়ের পরদিন তাঁকে অফিস যেতে দেখে তিনি আশ্চর্য হননি। শুধু যাবার সময় মনে পড়িয়ে দিয়েছিলেন, জামাই-এর চাকরির চেষ্টাটা আজকে একটু ভাল করে করতে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল, তবু বাড়ীর কর্তা সেদিন ফিরলেন না অফিস থেকে। জামাই-এর চাকরির কতদূর কি হল জানবার জন্য মৃণালিনী একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। আটটা বাজল, ন'টা বাজল—কর্তার দেখা নাই। জামাই-এর চাকরির চেষ্টায় ঠিক কতটা সময় লাগতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর ঠিক ধারণা নাই। তবে এত রাত্রি যে সে জন্য হচ্ছে না, এ কথা তিনি বুঝে গিয়েছেন ততক্ষণে। নাজিরবাবু ফিরলেন রাত দশটার পর। এসেই শুয়ে পড়লেন তক্তাপোশে। কী আবার হল? শরীর খারাপ? কোন কথার জবাব দেন না। কত কি ভেবে নিলেন রিনির মা। ঝাল বিস্কুট চিবুচ্ছে না। সে গন্ধটাও নাকে আসছে না! তবে? স্বামীর এ ভাব তিনি কখন দেখেননি এর আগে।

বাড়ীর লোকেই এ সব খবর জানতে পারে সব চেয়ে শেষে। ব্যাপারটা গুরুতর। মৃণালিনী জানতে পারলেন যখন পাড়ার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি রাত এগারটার সময় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রিনির বাবা বাড়ী থেকে কিছুতেই বেরুবেন না। গোঁজ হয়ে বসে রয়েছেন খাটের উপর। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকেরা ভিতরে এলেন।

'যা ধরা পড়েছে, তা ছাড়া আরও অন্য গণ্ডগোল বেরুতে পারে নাকি পুরনো বই খাতা ঘাঁটলে ?"

"না।"

"টাকা কিছু রেখেছেন ?"

"না !"

"যোগাড় করতে পারবেন টাকাটা কোন রকমে ?"

"না।"

এছাড়া আর একটি কথাও বার করা গেল না তাঁর মুখ থেকে। শুভার্থীরা চলে গেলেন।

তারপর সবই জানতে পারলেন মৃণালিনী নতুন জামাই-এর কাছ থেকে। রিনির বাবার লেখা হিসাবের খাতায় গোলমাল বেরিয়েছে। কাল উনি ছুটি নেওয়ায় যিনি ওঁর জায়গায় কাজ করেন তাঁরই প্রথম খট্‌কা লেগেছিল। তিনিই সাহেবকে দেখান। তারপর আজ ওঁর সম্মুখে সাহেব এত রাত পর্যন্ত সেই খাতা পরীক্ষা করেন। দেড় হাজার টাকার গোলমাল বেরিয়েছে। সাহেব একদিনের সময় দিয়েছেন টাকাটা ফেরত দেবার জন্য। ফেরত দিলে থানা পুলিশ করবেন না বলেছেন।

সে রাত্রিতে শুধু তাঁদের কেন, প্রতিবেশীদেরও ঘুম হ'ল না। ভোর বেলাতে মৃণালিনী স্বামীর নাম দিয়ে ছেলেদের কাছে 'প্রিপেড' টেলিগ্রাম পাঠালেন—'ভীষণ বিপদ ; অবশ্য আসবে ; জবাব দিও।'

সারা দিন রাতের মধ্যে কোন জবাব পাওয়া গেল না সে

টেলিগ্রামের। গত কয়েক বছরের হিসাবের খাতা-বই পরীক্ষা করায় আরও ছয়-সাত হাজার টাকা তছরুপের প্রমাণ পাওয়া গেল। বাড়ী-শুদ্ধ লোকের কান্নাকাটির মধ্যে পুলিশ নাজিরবাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

থানা পুলিশ, লোকজন—একেবারে ঝড় বয়ে গেল বাড়ীর উপর দিয়ে। গত সপ্তাহের বিপদটার চাইতেও এ সমস্যাটা অনেক বড়। বর্তমান বিপদটার সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ জড়ান। যে দুঃসময়ের বিভীষিকা তিনি দেখতেন চিরকাল, সেইটা হঠাৎ কাছে এসে গিয়েছে বৈধব্যের আগেই। ছেলেদের টেলিগ্রামের জবাব না আসায়, তাঁর আতঙ্ক বেড়েছে আরও বেশী। ভয় কি শুধু এক জিনিসের? পুলিশের লোকেরা খবর সংগ্রহের জন্য আনাগোনা আরম্ভ করেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকমের উদ্ভট প্রশ্ন করে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত উত্যক্ত করে তুলল। বাড়ীর লোকদের আরও কত রকমে জ্বালাতন করবে কে জানে! লোকবলও নাই, অর্থবলও নাই। শুধু মনের জোর সম্বল করে কি এরকম প্রতিবেশের সঙ্গে লড়াই করা যায়! এতগুলো কাচ্চা-বাচ্চাকে দুবেলা খাওয়াতে হবে, মোকদ্দমা চালাতে হবে, স্বামীকে জেল থেকে খালাস করবার জন্য, আরও কত কি করতে হবে; দরকার টাকার। পুলিশ জামাইকেও থানাতে ডেকেছিল। তিন ঘণ্টা ধরে প্রশ্ন করেছে। যদিই বা না পালাত, এখন এই পুলিশের ভয়েই হয়ত পালাবে। তাহলেই ষোল-কলা পূর্ণ হয়। ও পালালে মোকদ্দমা করবার লোকটা পর্যন্ত থাকবে না।

কত দিক যে মৃণালিনীকে সামলাতে হবে একা তার ঠিক নাই। পাড়ার লোকদের কাছে স্বামীর তহবিল তছরুপের কথাটা একেবারে অস্বীকার করবার কোন অর্থ হয় না। পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে অযাচিতভাবে বলা আরম্ভ করেছেন যে, নাজিরবাবুর সব টাকা খরচ হয়েছে তাঁর সংসার আর ছেলেমেয়েদের জন্য। বদ খেয়ালের জন্য তহবিল তছরুপের লজ্জা যে আরও বেশী। ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে

দিলেন বন্ধুদের কাছে এই ভাবে কথা বলতে। কিন্তু পুলিশের লোকের কাছে এ ধরণের কথা বলা চলে না। তাদের কাছে বলতে হয়—স্বামীর মাইনের চেয়ে সংসারের খরচ বেশী ছিল না; আর রিনির বিয়ের খরচটা চলেছে পুরনো গয়না বেচে।

কাজটা খুব সহজ নয়। ছেলেপিলেরা সব গুলিয়ে ফেলল। তারা পুলিশের লোকের কাছে বলল যে, রিনির বিয়ের খরচ বাবা দিয়েছেন; আর পাড়ার লোকের কাছে বলল যে, টাকাটা এসেছে পুরনো গয়না বেচে।

শুধু কি তাই। গুজব রটেছে যে, সি-আই-ডি'র লোকেরা ঘুরছে চারিদিকে হাঁড়ির খবর জানবার জন্য। কে হিতৈষী, আর কে পুলিশের চর বোঝা দায়। ভয়ে মরেন রিনির মা। আত্মরক্ষার কৌশল বদলাতে হল তাঁকে তিন দিনের দিন। ছেলেমেয়েদের উপর হুকুম হয়ে গেল, তারা যেন কারও সঙ্গে কথা না বলে আর।

সব চেয়ে মুশকিল হচ্ছে যে, সরকারী হিসাব-নিরীক্ষক পুরনো হিসাবের খাতা দেখে প্রত্যহ কিছু কিছু নতুন চুরির হদিস পাচ্ছেন। স্বামীর বদখেয়ালে খরচ ছিল, জানতেন! কিন্তু অত টাকা! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। সারা রাত জেগে থাকেন মৃণালিনী। নিজের জন্য তিনি ভাবেন না। ডুবে মরতে পারেন, যেখানে দু'চোখ যায় চলে যেতে পারেন; কিন্তু অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলো যে আছে! এগুলোর বাবাতো এই! আর মা-ও যদি চলে যায় তা'হলে যে ভেসে যাবে এরা! তিনি থাকতেও হয়ত ভেসে যাবে! দু'হাতে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখলেও হয়ত ভেসে যাবে! নিষ্করুণ সংসারের একটানা বিপদের তোড় আড়াল করে দাঁড়ান কি তাঁর মত মেয়েমানুষের কাজ! তিনি একা কতটুকু কি করতে পারেন! ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

এরই মধ্যে একটা মেয়েমানুষ হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে উঠোনের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বুক চাপড়ায়, আর কাঁদে, আর

কত কি বলে। কে? ঘুরনি কাহারণী! এ আবার কেন? এও তাঁর কপালে ছিল! সাহস দেখ! জামাই, ছেলেমেয়ে সবাই বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করে! গুটি গুটি পাড়ার ছেলে-মেয়েরাও এসে ঢুকছে এক এক করে বাড়ির ভিতর। পাড়ার ছেলেরা লক্ষ্য করেছে যে, দিন কয়েক থেকে এই বাড়ীতে একটার পর আর একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। বাড়ীতেও এই গল্প, স্কুলেও এই গল্প, বাজারেও এই গল্প। এরই মধ্যে যে কথাটা বড়রা আকারে ইঙ্গিতে বলতেন, ছোটদের না বুঝতে দেবার জন্য এবং ছোটরা প্রত্যেকেই বুঝত—সেই ফিসফিস করে বলা কথাটা হঠাৎ জীয়ন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে নাজিরবাবুর বাড়ীর উঠোনে।

ঘুরনি কাহারণী বলছে যে, খানিক আগে থানার পুলিশ কনষ্টেবল গিয়েছিল তার বাড়ীতে, নাজিরবাবু তাকে কি কি গহনা দিয়েছেন জানতে। তাকে নাকি এই গহনাগুলোর জন্য জেলে পোরা হবে, দারোগাবাবু ঠিক করেছেন। নৃসিংহ স্যাক্‌রা নাকি পুলিশের সাক্ষী। কনষ্টেবল বলেছে যে, গহনাগুলো সে যদি দারোগাবাবুকে দিয়ে দেয়, তাহলেই এক সে হাজতবাস থেকে বাঁচতে পারে।

"এখন মা আপনিই বলুন, আমার কি দোষ এর মধ্যে? চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি। যে চুরি করেছে তাকে ফাঁসি দাও, জেল দাও, যা ইচ্ছা কর। কিন্তু আমাকে নিয়ে টানাটানি—এটা কি ঠিক হবে?"

আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলে না মৃণালিনী। "বেরো! বেরিয়ে যা বলছি আমার বাড়ী থেকে এখনি! এখনও গেলি না! দাঁড়াতো রে!"

পাশে রাখা কর্তার ছাতাটাকে হাতে নিয়ে তুলতেই ঘুরনি কাহারণী শাপ-শাপান্ত করতে করতে বেরিয়ে গেল।

"যাকে চিনি না—যার মুখ কখনও জীবনে দেখিনি—সে বাড়ীর উপর উজিয়ে এসেছে গালাগালি করতে।" চোখ ফেটে জল এল

তাঁর কথাটা বলতে বলতে। কাঁদতে কাঁদতেই পাড়ার ছেলেমেয়েদের তাড়া দিয়ে উঠলেন—"তোরা কি মজা দেখতে এসেছিস ; বেরো। বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

ঘুরনি কাহারণী তাঁর কাছে ন্যায় বিচার পাবার আশায় কেন এসেছিল, সে কথা তিনি বহু ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। তবে কি সে ভেবে নিয়েছে যে, তিনি পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন ? বিচিত্র নয় কিছু। কত কীই যে তাঁর কপালে আছে।

উত্তর নাই বা এল ; তবু তিনি প্রত্যহ ছেলেদের কাকুতি মিনতি করে চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন। জামাই প্রথম দুদিন একটু দৌড়ঝাঁপ করেছিল শ্বশুরের মোকদ্দমার তদ্বিরে। এখন ঢিলে পড়েছে। একটু যেন অন্য রকমের ভাব। জেলখানায় আর টিফিন কেরিয়ারে করে ভাত নিয়ে যেতে রাজী নয় সে। এর মধ্যে মৃণালিনী অন্য একটা আশঙ্কার গন্ধ পাচ্ছেন—পিঁপড়েরা যেমন করে আগে থেকে জল ঝড়ের সূচনা পায়, তেমনি করে। জামাইও একটু যেন শাশুড়ীকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। হতে পারে যে, নিতাই এখন ঘরের কোণায় বসে রিনির সঙ্গে হাসি গল্প করতে চায় , তাই শ্বশুরের ব্যাপারে গা লাগাচ্ছে না ; কিন্তু মৃণালিনীর মন বলছে অন্য কথা।

পাড়ার একটি ছেলে নতুন উকিল হয়েছে। জামাইএর হাতে চারটে টাকা দিয়ে সেই উকিলের কাছে পাঠিয়েছিলেন, মোকদ্দমার দেখাশোনা করবার জন্য। নিতাই উকিলবাবুর বাড়ী থেকে এসে বলল—"অনেক টাকার দরকার আসামীকে খালাস করতে গেলে। আমি বরঞ্চ দাদাদের ওখানে নিজে গিয়ে একবার দেখি। কি বলেন ? আসতে যদি রাজী নাও হন, তা হলেও গিয়ে পা জড়িয়ে ধরলে অন্ততঃ কিছু টাকা না দিয়ে পারবেন না। জামাই শ্বশুরের জন্য এত করছে, আর ছেলে হয়ে বাপের জন্য করবে না। চক্ষু লজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে।"

বুক দুর দুর করছে মৃণালিনীর।

"এখানে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার। একি মেয়েমানুষে পারে ?"

"ছুটো দিন কোন রকমে চালিয়ে নিন। কাল, পরশু,—আমি তরশু দিনই ফিরে আসবো।"

হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলল মৃণালিনীর মাথায়।

"নতুন জামাইএর একা সেখানে যাওয়া ভাল দেখায় না। বরঞ্চ রিনিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"না না। এখন একটা পয়সার দাম আছে আপনার সংসারে। একজন মানুষের যাতায়াতের খরচ আছে তো।"

তিনি বারণ করলেন। রিনিকে দিয়ে বারণ করালেন। তবু জামাইকে আটকানো গেল না কিছুতেই। জানা কথা যে সে আর ফিরবে না। বোকা মেয়েটা এখনও বোঝেনি সে কথা। ভাবছে— পালালে, বিয়ের আগেই পালাত। রিনিটা ভুলে গিয়েছে যে তখনও নিতাই চাকরি পাবার আশা রাখত শ্বশুরের তদ্বিরের জোরে।

...এতদিনে ষোলকলা পূর্ণ হ'ল। যেদিকে তাকাও—অন্ধকার। যেদিকে পা বাড়াও, হোঁচট খাবে! ইচ্ছা থাকলেও কিছু করবার নাই! কোন উপায় কি রেখেছে সেই লোকটা! যে লোকটার হাতে মা তাঁকে সাতপাক দিয়ে সঁপে দিয়েছিল, নিজে কোনরকমে দায় মুক্ত হবার জন্য! হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারল না ? যবে থেকে এ বাড়ীতে এসেছি, তবে থেকে জ্বলে পুড়ে মরছি। কুকুর বিড়ালের মত ছু-বেলা ছু-মুঠো খেতে দিয়েছে ঠিকই ; কিন্তু একদিনও একটা ভাল করে কথা বলেছে ? জানে না। ওসব শেখেনি কোনদিন। ভদ্র ব্যবহার শিখতে হয়। শিখতে হলে ভদ্দর লোকদের সঙ্গে মিশতে হয়। ওর আলাপ পরিচয় সব যে ছোট-লোকদের সঙ্গে! বদ যত সব! লজ্জাও করে না! গম্ভীর হয়ে থাকে—ভারিক্কী চাল! যেন কত বড় জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি! ভয়ে একদিনও একটা জোর গলায় কথা বলতে পারিনি ওই মানুষটার

সঙ্গে। ওরই জন্য আজ আমার এই খোয়ার! লোকের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হয় অষ্টপ্রহর! ছেলেমেয়ে ঘরবাড়ী কিছুর উপর নিজের বলে একটা টান নাই লোকটার! অদ্ভুত! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না! এমন যার বৈরাগী বৈরাগী ভাব, একটা বউ মরলে সে আবার বিয়ে করতে যায় কেন? বছর বছর কুকুর বিড়ালের মত ছেলেপিলেই বা হয় কেন তার? যে জিনিসগুলোকে দশজনে খারাপ বলে, টান শুধু সেইগুলোর উপর! ছি ছি ছি! এত স্বার্থপর! এত অবুঝ! নিজের বদখেয়ালটাই হল আসল! ভাসিয়ে দিয়ে গেল সকলকে! জেলে পচে মবাই উচিত ওরকম লোকের!...

"মাসিমা!"

পাড়ার সেই উকিল ছেলেটি এসেছে। ধড়মড়িয়ে উঠে তাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এসে বসালেন। তার কাছ থেকেই শুনলেন স্বামীর খবর। এখন সে একবার জেলখানাতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে মোকদ্দমার তদ্বিরের সূত্রে। উকিলকে দেখা করতে দেয়। জেলরবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে। বলা আছে তাঁকে। মৃণালিনী যদি যান এই সময় তাহলে স্বামীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারে সে। কত কিছু তো বলবার থাকতে পারে। গেলে সাড়ে দশটার সময় জেলের সম্মুখের গাছতলায় যেন অপেক্ষা করেন তার জন্য। এই উকিল ছেলেটির কাছ থেকেই মৃণালিনী কথায় কথায় জানতে পারলেন যে, সেই চারটে টাকা জামাই তাঁকে দেয়নি।

সব সমান! যত সব জোটেও কি তাঁরই কপালে! কথাটা রিনিকে বললেন না; মেয়েটার সারাজীবন যে চোখের জলেই কাটবে। তবে বোঝা আর বাড়িয়ে লাভ কি!

জেলখানায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছা তাঁর আদপেই ছিল না। স্বামী জামাইএর মারফত বিড়ি সিগারেট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। প্রথম দুইদিন দেওয়া হয়েছিল। জামাই চলে যাওয়ায় ভেবেছিলেন

এ খরচটা বাঁচল। দেখা করতে গেলে আবার সেই কথাটা উঠবে কাজেই না দেখা করাই ভাল, এই ছিল তাঁর মনোভাব। যে লোকটার হাতে পড়ে, সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরছেন, তাঁর সঙ্গে বলবার মত নূতন কথা কীই বা থাকতে পারে? তবু না বলতে পারলেন না উকীল ছেলেটির কাছে। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাব না বলাটা এমনিতেই দেখতে খারাপ। তার উপর ছেলেটি নিজে থেকে জেলরবাবুকে বলে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে এসেছে তাঁর। এক্ষেত্রে দেখা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাটা আরও অশোভন হ'ত। তাই তাঁকে যেতেই হ'ল।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাড়ীর একমাত্র ছাতাটাকে না নিয়ে উপায় ছিল না। যে জিনিসগুলোকে তিনি অপছন্দ করেন, ঠিক সেইগুলোই তাঁর ঘাড়ে এসে চাপে, এ তিনি চিরকাল লক্ষ্য করে আসছেন! ছাতার বাঁট থেকে ভক ভক করে সিগারেটের গন্ধ বার হচ্ছে। এ গন্ধ বৃষ্টিতে ধুলেও যায় না।

স্বামীর জন্য বিড়ি সিগারেট ইচ্ছা করেই নিলেন না। অত বাজে খরচ করবার মত পয়সা তাঁর নাই। এ নিয়ে আজ যদি স্বামী রাগারাগি করেন, তাহলে তাঁকে বেশ করে হক কথা শুনিয়ে দেবেন তিনি। অনেককাল মুখ বুঁজে সব অত্যাচার সহ্য করেছেন; আর তিনি চুপ করে থাকবেন না। ছেলেপিলের মুখে দুটি অন্ন দেওয়ার চেয়েও তাঁর নেশাটাই বড় হল নাকি?

বাড়ী থেকে বার হবার সময় থেকে লজ্জা লজ্জা করছে। লোকে বোধ হয় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাঁকে চিনিয়ে দিচ্ছে—'ওই দেখ চোরের বউ যাচ্ছে। সেই যে লোকটাকে হাতকড়ি দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছে তেলের ঘানি ঘোরাবার জন্য— তার বউ। ঘুরনি কাহারণীর সঙ্গে ওর কুটোকুটি ঝগড়া।...'

...ছি ছি ছি! এই জীবন নিয়ে আবার বেঁচে থাকা। এই মুখ আবার বাইরের লোককে দেখানো!

ছাতাটা সঙ্গে থাকায় একটু সুবিধা হয়েছে। তবু একটু মুখ লুকোবার আড়াল পাওয়া যাচ্ছে। জেলখানায় যাওয়ার রাস্তায় যত এগোচ্ছেন ততই চলবার ভঙ্গী আড়ষ্ট হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যে, পথচারীরা নিঃসন্দেহে ধরতে পারছে তিনি কোথায় যাচ্ছেন। মাথার কাপড় টেনে দিতে গিয়ে নিজের হাতের তামাকের গন্ধটা নাকে গেল। গা ঘিন ঘিন করে উঠছে। ছাতার বাঁটের গন্ধটা তাঁর হাতে লেগে গিয়েছে। যে লোকটার সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন তারই জন্য তাঁর আজ এই দুর্দশা! এই বিফল জীবনের শত ব্যর্থতার জন্য যে লোকটা দায়ী, আজকে তাকে উচিত কথা বলবেন! ভাবে কি সে? নিজের খেয়াল খুশিতে, যে লোকটা বাড়ীর লোকের সুখ সুবিধা পায়ের তলায় মাড়িয়ে পিষে, চটকে চলে গিয়েছে, আজ একবার তাকে সম্মুখে পেলে হয়! মনের ভিতরের এতকালকার পুঞ্জীভূত গ্লানি ও বদ্ধ আক্রোশ আজ তাঁকে মরিয়া করে তুলেছে।

...দেখ, কি করেছ তুমি! যে জানোয়াররা নিজের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে, তারাও বোধ হয় তোমার চাইতে ভাল! তাদের যে বাচ্চাগুলো মায়ের চেষ্টায় বেঁচে যায়, সেগুলোর সঙ্গে তারা বোধ হয় তোমার মত ব্যবহার করে না। ঘুরনি কহারণী গয়না দেখিয়ে গেল; ঝাল বিস্কুটওয়ালা বাকীর তাগিদ দিয়ে গেল। তোমার সেই ভিটামিনের ওষুধওয়ালাই শুধু আসেনি এখনও বাড়ীতে! কেন? কিসের জন্য আমি এসব সহ্য করতে যাব? বাড়ীর লোকের জন্য চুরি করনি তুমি! জেলে এসে কিছু মাথা কেননি! যতটা বোকাহাবা আমায় ভাব, ততটা বোকাহাবা আমি নই। চুপ করে থাকি বলে ভেবো না যে আমি কিছু বুঝি না! অন্য কোন বউ হ'ত তো ঝেঁটিয়ে তোমায় শায়েস্তা করত!

রাগের জ্বালায় মনে মনে মহলা দিতে দিতে চলেছেন মৃণালিনী। তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প—স্বামীকে আজ এই সব কথা শোনাবেন। এর

চেয়েও কড়া ভাষায় বলা উচিত, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না সে সব কথা। এ মনের জোর তিনি এর আগে কখনও পান নি।

জেলখানা দেখা যাচ্ছে। আগে কখন দেখেন নি। একটু ভয় ভয় করে। জেল গেটের সম্মুখের পাকুড় গাছটার তলায় উকিলবাবু তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। পথের ধারে জেলওয়ার্ডারদের বাসা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তখনও। বিরাট পাকুড় গাছটার ডালে ডালে হাজার হাজার বাদুড় ঝুলছে; কেন যেন দেখলেই গা ছম ছম করে। ...তাঁদের গ্রামের চৌধুরী-পুকুরে যাবার পথের ধারের বাদুড়-ভরা গাছটার জন্য ছোট-বেলায় একা স্নান করতে যেতে ভয় ভয় করত। সেই জায়গাটায় গিয়ে কিছুতেই গাছের দিকে তাকাতেন না। ...জেল গেটের বন্দুকধারী পাহারা তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। জ'লো হাওয়ায় একটা চেনা গন্ধ নাকে ভেসে আসছে। মিষ্টি গন্ধ। হবিষ্যি ঘরের গন্ধ। তার মায়ের রান্না ঘরের গন্ধ। ওয়ার্ডারদের রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া আসছে, তারই গন্ধ। কয়লার উনুনে রেঁধে রেঁধে আম কাঠের ধোঁয়ার গন্ধটা প্রায় ভুলে গিয়েছেন আজকাল। মায়ের গন্ধ। পূজোর ভোগ রান্নার গন্ধ। গাজনের সন্ন্যাসীদের ধুনির গন্ধ। ফেলে-আসা স্বর্গের জানা অজানা আরও কত জিনিস এই হারিয়ে-যাওয়া গন্ধটার সঙ্গে মেশানো। অণু পরমাণুর মধ্যে ঝিমিয়ে-পড়া কত যুগের কত কিছু তার অজানতে হঠাৎ জেগে উঠেছে।...

উকিলবাবু এলেন সাইকেলে। গেটের প্রহরীকে দিয়ে অফিসে খবর দিলেন। নাজিরবাবুকে ডেকে পাঠান হল। তাঁরাও ভিতরে ঢুকলেন। স্বামী-স্ত্রীর কথা বলবার সুবিধা করে দেবার জন্য উকিলবাবু দূরে গিয়ে জেলরবাবুর সঙ্গে গল্প করছেন।

ভিতরেও সেই হবিষ্যি ঘরের গন্ধটা নাকে আসছে। নাজিরবাবু গম্ভীর হয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মৃণালিনীর মনে হ'ল স্বামী লজ্জায় সঙ্কোচে কথা বলতে পারছেন না। নিজের খানিক

আগের সঙ্কল্পের কথাটা ভুলে গিয়েছেন তিনি। বললেন "কেন আমাকে বিয়ে করে আনতে গিয়েছিলে! আমাকে ঘরে না আনলে, তোমার বড় ছেলেরা আজ তোমায় মাথায় করে রাখত। তা হলে আজ তোমার মোকদ্দমার তদ্বির আর খরচের ভাবনা? সৎমার উপর বিরক্ত বলেই এই বিপদেও তারা তোমার খোঁজ নিল না। কেন এ ভুল তুমি করেছিলে?"

চোখ ফেটে জল আসছে তাঁর কথাগুলো বলতে বলতে।

জেলরবাবুর গায়ে বৃষ্টির ছাট এসে লাগতে পারে এই আশঙ্কায়, একজন ওয়ার্ডার লোহার গরাদের উপরকার পরদাটা টেনে দিল।

মৃণালিনী চোখের জলের মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে দেখলেন, দুটি ঠোঁট নড়ল পাথরের বুড়ো শিবের।

"নিতাইকে সেদিন বলেছিলাম না, কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি, আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে যেতে?"

ছাতার বাঁটের দম-আটকানো গন্ধটা এতক্ষণে আবার পেলেন মৃণালিনী…। গা ঘিনঘিন করে উঠেছে।

অভিজ্ঞতা

তামাকের আমেজ জমে এসেছে। স্ত্রীর হাতে হুঁকোটা দিয়ে এইবার দিবানিদ্রার যোগাড় করবেন, থানার দারোগা শ্রীরামভরোসা প্রসাদ। হাই উঠেছে; তুড়ি পড়েছে; শুনে স্ত্রী দাঁড়িয়েছেন; সব ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক চলেছে।

"দারোগাজী!"

মৃদু, কুণ্ঠিত গলার স্বর বিরিঞ্চি সিং কনস্টেবলের। বাইরে থেকে ডাকছে, অতি অনিচ্ছা ও দ্বিধার সঙ্গে।

কণ্ঠস্বরের এই দ্বিধাটুকু থেকেই দারোগাজী বুঝে গিয়েছেন কেন ডাকছে। জেলা সদর থেকে কোন হাকিম এলেও, থানার কনস্টেবল তাঁর "কোয়ার্টার"-এ তাঁকে ডাকতে আসত ঠিকই: কিন্তু সে ডাক এমন মৃদু কুণ্ঠাজড়িত হত না। আসত ছুটতে ছুটতে, হাঁফাতে হাঁপাতে। উর্দি পরে বার হবার জরুরী তলব—চাপা গলায় অথচ জোরে জোরে—লাউডস্পীকারে চুপিচুপি কথা বললে যেমন শোনায় সেই রকম। সে ডাক সব দারোগার জানা—সাবেক কাল থেকে চলে আসছে, সব থানায়, সব দারোগার বেলায়। কিন্তু এখনকার এই বিরিঞ্চি সিং-এর ডাক হচ্ছে একেবারে অন্য জিনিস। মাস দেড়েক আগে পর্যন্ত, এ সুরের ডাক, তাঁকে কখনও শুনতে হয়নি জীবনে। কোন কনস্টেবলের সাহস হয়নি কখনও, রামভরোসা দারোগার ঘুমের ব্যাঘাত করতে। যখন যেখানে বদলি হয়েছেন, সেখানেই এই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গিয়েছে। আজ সে নিয়ম বদলেছে। তিনি কাউকে বলে দেননি; তবু সবাই জানে যে আগেকার নিয়ম আজ আর নেই।

পুরনো দিনের কথা মনে করেই বিরিঞ্চি সিংএর এই কুণ্ঠা। হৃতরাজ্য রাজাকে সম্মান দেখাচ্ছে বিশ্বস্ত অনুচর।

"কে? বিরিঞ্চি সিং?

"হুজুর"

"কি ব্যাপার?"

"খুনের কেস হুজুর। গ্রামের লোক খবর এনেছে।"

"আচ্ছা চল—যাচ্ছি।"

হুঁকোতে টান মারা বন্ধ না করে, বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, ঘুম তাঁর মাটি হল ঠিকই, তবে এমন একটা কিছু ব্যাপার না যার জন্যে তাঁকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে থানার অফিস ঘরে যেতে হবে এই মুহূর্তে।

এইসব সময়ের সান্ত্বনা স্ত্রীর নীরব সহানুভূতিটুকু। চিরকাল ভদ্রমহিলা এ রকম নীরব ছিলেন না। স্বামীর কথার মিষ্টি করে পাল্‌টা জবাব তিনি চিরদিন দিয়ে এসেছেন। খেতে বসে চাক্‌রে-জীবনের খুঁটিনাটি স্ত্রীর কাছে গল্প করা দারোগাজীর অভ্যাস। ঘুষ নেন না বলে ডিপার্টমেণ্টএ তাঁর কত নাম, উপরওয়ালারা তাঁকে কত খাতির করেন, এই সব কথাই ছিল গল্পের বিষয়বস্তু। গৃহিণীর এ সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, একুশ বছর ধরে প্রত্যহ শুনতে শুনতে। তিনি পাল্‌টা প্রশ্ন করতেন বিরক্ত হয়ে—"আচ্ছা এত তো তোমার খাতির, তবে তোমাকে ইন্সপেক্টর করে না কেন?"

নিজের চাকরে জীবনের সততার বড়াই, তখনকার মত বন্ধ হত; কিন্তু পরের দিন আবার, যে কে সে।

কিম্বা হয়তো কোনদিন দারোগাজী বললেন—"ঘুষ না নেওয়ার জন্য আর্থিক স্বাচ্ছল্য আমার কোনদিনও হবে না; কিন্তু এত বড় থানার এলাকার মধ্যে তো আমি রাজা। এখানে দারোগাজীর সম্মুখে সব বাছাধনকে মাথা নোয়াতেই হবে, সে তুমি যে-ই হও না কেন!"

"আচ্ছা, এইবার রাজরাণী চলল বাসন মাজতে। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।"

এই রকম চলত থানার রাজা-রাণীতে। কিন্তু দেড় মাস থেকে গল্পের ধারা গিয়েছে একেবারে বদলে। দারোগাজী পারলে পরে চুপ করেই থাকতেন। কিন্তু একজন কারও কাছে দুঃখের কথা না বলতে পারলে, বুকের বোঝা হাল্‌কা হয় না যে। এখনকার কথাবার্তার ধুয়ো দারোগাগিরির ঝকমারি। দিকদারি ধরে গিয়েছে তাঁর এ চাকরিতে। প্রথম জীবনেই ভুল করে ফেলেছেন এ লাইন-এ এসে।...হ্যাঁকে না করতে পারতে, দিনকে রাত করতে পারতে, উপরওয়ালার অকাজ কুজাজে সাহায্য করতে পারতে, সে যদি বলে জল উঁচু তুমিও জলকে উঁচু বলতে পারতে, তবে চাকরিতে তোমার সুনাম হ'ত, উন্নতি হত!... চাকরি ছেড়ে চলে যাবার সাহস যে নেই।...

দারোগাগিন্নী চুপ করে শোনেন। শুনতে শুনতে এক এক সময় চোখে জল এসে যায় আজকাল।

"ভোখরাহার কেস হুজুর।"

ফিরে যাবার পথে বিরিঞ্চি সিং সতর্কবাণী দিয়ে যাচ্ছে।

ভোখরাহার! চমকে উঠেছেন দারোগাজী। তামাকের ধোঁয়া গলায় লাগল। ভোখরাহা বলল না? কেঁপে উঠেছে বুক রাজরাণীর। ওই গ্রামের একটা কাণ্ড নিয়েই থানার রাজা নিজের রাজ্যে ফকিরেরও অধম হয়ে গিয়েছে দেড় মাস থেকে।

...কে জানে ইনি আবার কে!

ধুতির খুঁট গায়ে দিয়েই দারোগাজী ছুটলেন থানা অফিসে। দারোগাগিন্নী দেয়ালের মহাবীরজীকে প্রণাম করলেন। আতঙ্ক আসে ভোখরাহা নামটাতে। কে জানে এও আবার সেই রকমই কোন কাণ্ড কিনা। সেদিনতো চাকরি যাব যাব হয়েছিল। কোন রকমে বেঁচে গিয়েছে। ওই যে সেই চাকরির বই থাকে না—তাতে দারোগাজীর নামে কালো দাগ পড়েছে, ভোখরাহার ব্যাপারটা নিয়ে। জেলার নতুন

পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টটা অতি বদ। লোকের চাকরি খাওয়ার জন্য হাঁ করে রয়েছে সব সময়।

স্বামীর কাছে তিনি সব শুনেছেন তো। হেন দিন নেই, যেদিন কারও না কারও চাকরি খাচ্ছে। আর মুখ কি খারাপ। থানায় যখন টুরএ আসে, একেবারে থরহরিকম্প লাগিয়ে দেয়। ছোট নেই, বড় নেই, সবার সম্মুখে গালাগালি দেয় থানার দারোগা কনস্টেবলদের।

দারোগাগিন্নীর খাওয়া-দাওয়া মাথায় চড়ল। হুঁকোয় টান মারতে পর্যন্ত ভুলে গেলেন।

মিনিট পনর বিশ পরে দারোগাজী যখন বাসায় ফিরলেন, তখন আর তাঁকে প্রশ্ন করতে হল না। নিজে থেকেই বললেন। তখনই তাঁকে বার হতে হবে, নালিশটার সরেজমিনে তদারক করতে; ধড়াচূড়া পরতে যেটুকু দেরী···ভোখরাহার সাঁওতালটোলায়, একটা বাপ ছেলেকে কেটেছে কুড়ুল দিয়ে।

"অন্য কোন গণ্ডগোল নেইতো এর মধ্যে?"

"মনে তো হচ্ছে না। তবে এখন কে বলতে পারে! কিছু বিশ্বাস নেই আজকালকার পুলিস সাহেবকে।"

সংক্ষেপে কথা। এঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ বোধহয় এ কথার মানে ধরতে পারবে না। নূতন পুলিস সাহেব দারোগাদের কর্মতৎপরতা পরীক্ষা করবার জন্য, নানা রকম ব্যবস্থা করছেন, এই রকম একটা গুজব রটেছে পুলিস মহলে।

···নিশ্চিন্দি আর নেই, এই পুলিসস্থপারের জ্বালায়। আগেকার কালে যখন সদর থেকে থানায় আসবার পথঘাট খারাপ ছিল তখন দারোগাগিরি ছিল আরামের চাকরি। আগে থেকে খবর না দিয়ে সাহেবের আসবার উপায় ছিল না। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। পিচের রাস্তা, মোটর গাড়ী,—মেমসাহেবকে নিয়ে বিকেলে হাওয়া খেতে বার হবার খরচও গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে নেওয়া যায়, থানা "ইন্সপেক্‌শন" করে। এ সাহেবটা আবার

কাউকে বিশ্বাস করে না। এর বদ্ধমূল ধারণা যে প্রত্যেকটা দারোগা, থানায় বসে বসে মিথ্যে ডায়েরি লেখে—পারতপক্ষে সরেজমিনে যেতে চায় না।

"জয় মহাবীরজী!"

সাইকেল নিয়ে কোয়ার্টার থেকে বার হলেন রামভরোসা প্রসাদ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাতে খাওয়ার আগেতো ফিরবই; সে আর বলতে!"

বাড়ীর আরামটুকুর উপর লোভই তাঁর চাকরিতে কাল হয়েছে। স্নানের আগে তেল মাখিয়ে তাঁকে আধ ঘণ্টা ডলাই-মলাই পর্যন্ত করে দেন তাঁর স্ত্রী নিজহাতে। তাঁর সততার কথাটাও যেমন তাঁর ডিপার্টমেন্টএর প্রত্যেকের জানা, তেমনি তাঁর আরামপ্রিয়তার কথাটাও।

গত মাসে পুলিস স্থপার, যখন তাঁর বিরুদ্ধে "প্রসিডিংস" এনেছিল, তখন স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে, কুঁড়ে লোক সে পছন্দ করে না পুলিস বিভাগে; তার চেয়ে নিজের কাজটি করে দুপয়সা ঘুষ খাওয়া অনেক ভাল। পুলিস স্থপার অবশ্য শোনা কথার উপর নির্ভর করে এ মন্তব্য করেনি। তিনি হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন উপরওয়ালার কাছে।

...রাত্রিতে খেয়েদেয়ে শুয়েছেন সেদিনও: ভোখরাহা থেকে খবর এল খুন-জখমের "কেস"এর। খবর এনেছিল সহদেও সিং—ভোখরাহার পূরণ সিংএর ছেলে। পূরণ সিংএর নাম সব দারোগার জানা। এক কালের দাগী আসামী—এখন বলে চাষবাস করে খায়—কিন্তু বিশ্বাস হয় না সেকথা। কেননা খরচ অবস্থা অনুপাতে অনেক বেশী; আলাপ পরিচয়ও চোর-ডাকাতের সঙ্গেই। নানা রকম গুজব শোনা যায় তার সম্বন্ধে; কিন্তু খোলাখুলি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে লোকে ভয় পায়। সেই বুড়ো পূরণ সিং জখম হয়েছে—খবর এনেছিল তার ছেলে। কোথায় কোন্ গ্রামে একজন দাগী চোর জখম হয়েছে; তার জন্য এই অন্ধকার রাত্রিতে এগার মাইল সাইকেলে যাওয়া—এ জিনিস

রামভরোসা দারোগার কোষ্ঠীতে লেখেনি। তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেননি—বলে দিয়েছিলেন, পরের দিন যাবেন তদন্ত করতে। পরের দিন ভোখরাহাতে গিয়ে দেখেন যে, পুলিস সাহেব তাঁর আগেই হাজির হয়েছেন সেখানে। সহদেও সিং রাত্রিতেই থানা হয়ে সাহেবের কাছে গিয়েছিল। শুনে সাহেব নিজে ছুটে এসেছে। তাঁকে দেখে সাহেব গ্রামের লোকজনের সম্মুখেই স্বাগত সম্ভাষণ করেছিলেন—"এতক্ষণে নবাব সাহেবের সময় হল ?" তারপর নিজের গাড়ীতে করে সংজ্ঞাহীন পূরণ সিংকে নিয়ে গেলেন সদর হাসপাতালে ভরতি করবার জন্য।

এর পরই হয়েছিল দারোগাজীর বিরুদ্ধে "প্রসিডিংস্"। তখন তিনি জানতে পারেন যে, পূরণ সিং হচ্ছে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের খাস বাহাল করা গুপ্তচর। সব থানায় এরকম "স্পাই" আছে। কি খবর দেয়, কত টাকা পায় সে শুধু জানে পুলিস সাহেব। থানার দারোগা পুলিস এদের নাম পর্যন্ত জানতে পারে না। এরা প্রায়ই চোর-ডাকাতদের দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা লোক। তবে দারোগা পুলিসের বিরুদ্ধে খবর কিছু কি আর দেয় না পুলিস সাহেবের কাছে ? তাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হয় চোর-ডাকাতের কাছেও আজকাল,—কে জানে, কে আবার কিনি! ঐ ঘটনার পর এ থানা থেকে তাঁকে বদলি করে দিলেও তিনি বাঁচতেন!···সাইকেলে যাবার সময় পথের দুধারের লোকরা দারোগাজীকে আদাব করছে; তিনি তাঁদের মুখের দিকে তাকাতেও পারছেন না; এরা সবাই জেনে গিয়েছে যে, পুলিস-সাহেবের চোখে তাঁর কদর কানাকড়িও না। পূরণ সিংএর পরিবারের খাতির সদরে দারোগাজীর চেয়েও বেশী। যতই ঢাকতে চেষ্টা করুন, একটা কুণ্ঠার ভাব এসে গিয়েছে তাঁর মনে, ওই পূরণ সিংএর কাণ্ডটার পর থেকে।

ভোখরাহার কাছাকাছি এসে গেলেন 'এতক্ষণে। সারাটা পথ

পূরণ সিংএর কথা ভাবতে ভাবতেই এসেছেন। গ্রামে ঢুকতে হয় রাজপুতটোলার মধ্যে দিয়ে। সাঁওতালটোলা এখান থেকে মাইলখানেক দূরে—একটা মজা নদীর ধারে। রাজপুতটোলায় বেশ ঘনবসতি। সরু রাস্তার ধারে একটা সরকারী ইঁদারা। ইঁদারার জল পড়ে পড়ে সেখানকার রাস্তায় এক হাঁটু কাদা-পাক জমেছে। এরই এক পাশের সরু শুকনো জায়গাটুকু দিয়ে তিনি সাবধানে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে গেলেন; ইঁদারাটার অন্যদিকে পূরণ সিংএর বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখের অপরিসর জায়গাটাতে মাসদেড়েক আগে—সেই কাণ্ডটার দিন—পুলিস সাহেব মোড়া পেতে বসেছিলেন। ওই জায়গাটাতেই দারোগাজীর মান-ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়েছে।...প্রাণপণ চেষ্টায় সেদিকে না তাকিয়ে. তিনি এগিয়ে গেলেন। ভোখরাহাতে ঢোকবার মুহূর্ত থেকে তাঁর সঙ্কুচিত ভাবটা আরও বেড়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে, 'আদাব হুজুর' করতে করতে।...বিদ্রূপ নয়তো?

সাঁওতালটুলিতে একটা বাড়ীতে ভিড় দেখে সেখানে নামলেন দারোগাজী। সাঁওতালরা তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিরসা মাঝির বউ চীৎকার করে কেঁদে তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে।

"ও দারোগা, ছাখ্ একবার কি করেছে। তিন মাসের দুধের ছেলে! আহা রে! কুড়ুল দিয়ে থেঁত্‌লে মাথাটা ভেঙ্গে দিয়েছে। বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে কি করে মেরেছে দেখ্, জানোয়ারটা!"

ঘরদুয়ার ঘুরে ঘুরে দেখলেন দারোগাজী। তক্‌তকে নিকানো উঠান। চৌকিদারের কড়া হুকুমে সব যেখানে যেমন ছিল, তেমনি রাখা আছে। বারান্দায় শিশুর মৃতদেহটা। তাকানো যায়না সেদিকে। মাথার ঘিলু বেরিয়ে গিয়েছে, মাছি ভন্‌ভন্ করছে, কালো জমা রক্তের উপর পিঁপড়ের সার। কুড়ুলখানা সেইখানেই পড়ে আছে। বেশ ভারী কুড়ুল। ঝকঝকে ধার। মাথার আঘাতটা কিন্তু কুড়ুলের ধারাল দিক দিয়ে লাগেনি। উঠানের এক জায়গায়

কিছু জ্বালানী কাঠ, কিছু কাঁচা ডালপালা, আর একখানা দা পড়ে রয়েছে। উপস্থিত সাঁওতালরা অতি মনোযোগের সঙ্গে দারোগাজীর গতিবিধি লক্ষ্য করছে। বিরসা মাঝি এক দৃষ্টে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে,—বেদনাভরা তার করুণ চাউনি; বিরসা আর বিরসার স্ত্রীর বয়স বেশী নয়। এইটি ই বোধ-হয় তাদের প্রথম সন্তান!

পরিবেশের ভয় আর বীভৎসতার গুমোট, তবু খানিকটা কাটছে ছেলের মায়ের একটানা কাঁদুনি আর চিৎকারে।

"ও দারোগা, ঐ খুনেটাকে ধরে নিয়ে যা জেলখানায়। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দে। ওর মতলব খারাপ। এরপর একদিন আমাকেও কাটবে ওই কুড়ুল দিয়ে। নিশ্চই কাটবে। আমার মন যে তাই বলছে। তখনও সূর্য ওঠেনি, দোয়েল ডেকেছে কি না ডেকেছে, শব্দ শুনে ঘুম ভাঙ্গলো।....কিরে! চমকে উঠেছি। কানের কাছেই! ঘরের বাইরেই! ছেলেটার বাপ দেখি ঘরের পশ্চিমের ময়না গাছটা কাটছে। ওইখানে, ওই দেখ্ না দারোগা, কাটা গাছের গোড়াটা যেখানে রয়েছে। এই ডালপালাগুলো সব ওই গাছের।···দেখেই হাঁ হাঁ করে উঠেছি আমি। ও গাছটা তোর কী ক্ষতি করেছে? খেতে ভাল না হোক, তবু ময়নারফল পাকলে খাওয়াতো চলে। বাড়ীর একদিকে একটু আবরুরওতো দরকার। আমি বলি—তা কাটছিস কেন? বলে—কুড়ুলের বাঁট হবে। বাঁট তয়ের করবি তো একটা মোটা ডালই না হয় কেটে নে; অত বড় গাছটা কি না কাটলে চলছে না? কে আমার কথায় কান দিচ্ছে! ছেলের বাপ তেড়ে জবাব দিল—উনানের জ্বালানি হবে। সে কী চোখ রাঙ্গিয়ে কথা! ওই রেগে কথা বলা দেখেই আমি ওর মতলব বুঝে গিয়েছি।" ··

দারোগাজীর কান খাড়া হয়ে ওঠে।

"ময়না গাছ কাটবার সময় রাগতে দেখে তুই বিরসার মতলব কি বুঝলি?"

একটু কেমন যেন হয় বিরসা মাঝির বউ। কান্না ও কথার স্রোত

দু'টোই এতক্ষণ একসঙ্গে সহজ ধারায় বইছিল। দারোগাজীর প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে, সেই কথা খোঁজবার চেষ্টায় কান্নার স্রোতেও বাধা পড়ল।

কথা বলে বিরসার শ্বশুর। "অত বড় বড় কাঁটা ডালে। ময়নার কাঁচা ডাল আবার লোকে কাটে নাকি জ্বালানি করবে বলে?"

"চোপ রও! দারোগাজী যখন তোকে জিজ্ঞাস করবেন, তখন কথা বলিস।"

কনস্টেবলের তাড়া খেয়ে বুড়ো থেমে গেল। কথা খুঁজে পেয়েছে বিরসার বউ। সে আরম্ভ করে অন্য কথা।···নদীর বালিতে গর্ত খুঁড়ে খাওয়ার জল নিয়ে আসতে হয়; তাই কলসী ভরতে সময় লাগে অনেকক্ষণ। কচি ছেলেটাকে বারান্দায় শুইয়ে রেখে সে গিয়েছিল জল আনতে। ফিরতি পথে সে বিরসার চীৎকার শুনতে পায়। চেঁচানির ধরণ শুনেই তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে দেখে এই কাণ্ড! অতটুকু বাচ্চা, কী-ই জানে, কী-ই বা বোঝে, ঘুমচ্ছিল, বাপ হয়ে কি করে পারল! আহা রে! ওরে রাক্ষস, ও ছেলে কি আমার একার—ও ছেলে যে তোরও!···

দারোগাজী স্ত্রীলোকটির কথার স্রোত বন্ধ করতে চান না। এ আর এর স্বামী যা প্রাণে চায়, বলুক। এদের কথা থেকেই তাঁকে বুঝে নিতে হবে আসল ব্যাপারটা।···নেশার ঝোঁকে করে নি তো কাণ্ডটা বিরসা মাঝি? তাঁর আগেকার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছে বিরসার স্ত্রী, এ-কথা দারোগাজীর খেয়াল আছে।

এতক্ষণে বিরসা মুখ খুলল।

"না না দারোগা, বিশ্বাস করিস না ওর কথা। আমি ছেলেটিকে মারিনি, অমন সুন্দর ছেলেকে কি মারতে পারা যায়?"

তার গলার স্বর ও কথার ভঙ্গীতে দারোগাজী আশ্চর্য হলেন। একুশ বছরের চাকরীর অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন, দোষ অস্বীকার

করবার সময় অপরাধীর কণ্ঠস্বর কেমন হয়।....এযে অন্য রকমের! এযে সত্য কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে! মুখ-চোখের ভাবও মিথ্যা বলবার সময়ের মত না! বহুবার জেলখাটা গুণ্ডাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সত্য বলবার নিখুঁত ভান করতে পারে; কিন্তু একজন সরল গ্রাম্য সাঁওতাল তা' পারবে কি করে?

"না দারোগা, ও মিছে কথা বলছে ফাঁসিকাঠে ঝুলবার ভয়ে। ওই কুড়ুলখান দিয়ে—" নতুন-আসা কান্নার তোড়ে বিরসার স্ত্রীর বাকি কথাগুলো বোঝা গেল না।

"ফাঁসিতে আমি ভয় পাইনেরে—বুঝলি। মারলে পরে আমি নিজেই স্বীকার করতাম দারোগার কাছে! তোকে বলতে হবে কেন! আমি নিজে থেকে থানায় গিয়ে দারোগাকে বলতাম, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দিয়ে দিতে। মরতে ভয় পাইনা রে, মরতে ভয় পাই না। এই কুড়ুল দিয়ে, আমি একা হাতে ভাল্লুকের সঙ্গে লড়েছি—বুঝলি! এ-কুড়ুল আমার বাপের কাছ থেকে পাওয়া। বাপের মুখে শুনেছি যে ঠাকুরদা তয়ের করিয়ে এনেছিল জংসন ইষ্টিশানের নামকরা কামারের কাছ থেকে, রেল-লাইনের লোহা দিয়ে। এমন কুড়ুল এই ভোখরাহা গ্রামে আর কারও নেই। তিন পুরুষ হয়ে গেল—আজ পর্যন্ত কখনও দাঁত পড়েনি। তেঁতুল কাঠ কাটলেও এর ধার ভোঁতা হয় না। জঙ্গলে কাঠ কাটবার সময় কুড়ুলটা কতবার বাঁচিয়েছে বাপকে, ঠাকুরদাকে, আমাকে, জন্তু-জানোয়ার, সাপখোপের হাত থেকে, তার কি ঠিকঠিকানা আছে! ওই কুড়ুল দিয়েই যদি আমি ছেলেটাকে মারব, তবে ঘ্যাচ্ করে কোপ না বসিয়ে, ভোঁতা দিকটা দিয়ে মাথা থেঁতলে দেবো কেন? আরে, ওই একরত্তি বাচ্চাকে মারতে আবার দা-কুড়ুল লাগে নাকি? পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে মরে যাবে, আঙ্গুল দিয়ে টিপে দিলে মরে যাবে, কিন্তু তা কি পারা যায়? ইচ্ছা থাকলেও তা' কি পারা যায়?"

'ইচ্ছা থাকলেও' কথাটা কানে লাগে দারোগাজীর। এ-কথাটা বলল কেন? এটা কি শুধু কথার মাত্রা?...

"না দারোগা, তুই ওর কথা বিশ্বাস করিস না। ও মেরেছে ঠিকই ছেলেটাকে—নিজ হাতে মেরেছে। ও আমাকেও ওই বাপের কুড়ুল দিয়েই কাটবে। সে আমি ময়না গাছ কাটা দেখেই টের পেয়েছি। ছেলের চেয়ে কখনও বউ আপন হয়? যে লোক ছেলেকে কাটতে পারে, সে কি আর বউকে রাখবে! কুড়ুলের প্রথম কোপটা যে আমার গর্দানে না পড়ে ময়না গাছে পড়েছে, সেই আমার ভাগ্যি!"

"ওর মনে গলদ আছে, তাই ও আমার বিরুদ্ধে বলছে তোর কাছে। নইলে কেউ কি নিজের মরদের বিরুদ্ধে দারোগার কাছে বলে? কুড়ুল গিয়ে লেগে, ছেলেটা মরেছে ঠিকই। সে-কথা কি আমি অস্বীকার করছি? কিন্তু আমি মারিনি, আমার হাত থেকে ছিট্‌কে গিয়ে লেগেছে কুড়ুলটা আপনা থেকে। কাঁচা ছালছাড়ানো ময়নাডাল দিয়ে নতুন বাঁট লাগিয়েছিলাম কুড়ুলে। কাঠ কাটবার সময় পিছলে বেরিয়ে গেল হাত থেকে। ছুটে গিয়ে লেগেছে একেবারে ওই কচি মাথাটায়। ময়না গাছটাই বোধ হয় শোধ নিল আমার উপর, অমন করে সেটাকে গোড়া থেকে কাটলাম বলে। গাছে ওরকম শোধ নেয়। গাছ কাটতে কাটতে চাপা পড়ে লোক মরতে দেখিসনি? গাছের ডাল কাটতে কাটতে, গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গতে দেখিসনি? আঁধার রাতে একলা পেলে গাছকে ভয় দেখাতে দেখিসনি? ময়না গাছটা বুঝি আগে থেকেই ছিল আমার বিরুদ্ধে। নইলে ময়না ডালের বাঁটটা অমন পিছল হয়ে উঠবে কেন হঠাৎ আমার হাতের মধ্যে?"

দারোগাজী কাঠ কাটবার জায়গাটা থেকে ছেলে শোয়াবার জায়গার দূরত্ব ইত্যাদি একটা আন্দাজ করে নিচ্ছেন মনে মনে। মাপজোখ পরে হবে। এখন তিনি এদের কথার মধ্যে বাধা দিতে চান না। বুঝছেন যে, আসল কথাটা এখনও বার হয়নি। বিরসার

স্ত্রী বোধ হয় ভাবল যে, তার স্বামীর কথাগুলো দারোগাজীর মনে বসেছে; সেইজন্য সে আগের চেয়েও বেশী চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করে—"না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না। ও আমায় সন্দেহ করে। কিছুদিন থেকে দেখছি সোনাই সা'র দোকানে সওদা কিনতে গেলে বিরক্ত হয়। বলেনি আমায় কিছু, কিন্তু বোঝা তো যায়। একটু চোখে চোখে রাখছে ও আমায় দিনকতক থেকে। এমন তো ও ছিল না। আমি কি বুঝিনা। ছেলেটার রং একটু ফরসা হয়েছে বলে সোনাই সা'র উপর ওর সন্দেহ।"

"এ যদি সত্যি না হবে, তবে তুই জানলি কি করে যে আমি সোনাই সা'কে সন্দেহ করি? জবাব দে আমার কথার। শোন্ দারোগা, কোন কথা আমি তোর কাছে লুকবো না। সোনাই সা লোকটা ভাল না। খুব খারাপ। কাল রাতে শয়তানটাকে আমি খুঁজেছিলাম। ধরতে পারলে আমি ওটাকে এই কুড়ুল দিয়েই সাবাড় করে দিতাম। বংশের ইজ্জত রাখতে গেলে ঠাকুরদার কুড়ুল দিয়ে ওটাকে খতম করা উচিত। ধরতে পারিনি। ছিল না বাড়ীতে। পালিয়ে ছিল। আঁচ পেয়েছিল বুঝি আগে থেকে।"

এতক্ষণে দারোগাজী শাঁসালো খবর পেতে আরম্ভ করেছেন। সফল হয়েছে তাঁর এতক্ষণকার ধৈর্য।

"দারোগা, শুনছিসতো ওর কথা! কাল রাতে ও গিয়েছিল সোনাই সা'র খোঁজে। কাল সকালেই ও বলেছে যে, যত বড় হচ্ছে ততই বাচ্চাটা দেখতে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কথাটা বাঁকা লাগল। শুনেই বুঝেছি। বোঝা তো যায়!"

"তোর মনে ভয় রয়েছে, তাই তুই বুঝেছিস। আমি ময়না গাছটা কেন কাটলাম তাও তুই না বলতেই বুঝেছিস! ভাবিস যে তোদের শয়তানী আমি ধরতে পারি না! তুই যে খানিক আগে দারোগাকে বললি,—ভোরে গাছ কাটার শব্দে তোর ঘুম ভেঙ্গে গেল,—মিছে কথা—এত মিছে কথাও তয়ের করে বলতে পারিস!

ঘুমিয়ে ছিলি না আরও কত! যত বোকা আমাকে ভাবিস, তত বোকা আমি নই, বুঝলি!”

বিরসার বউ চিৎকার করে ওঠে—“ওরে বাপরে। দারোগা তুই আমাকে বাঁচা! নইলে ও আমাকে মেরে ফেলে দেবে এখনই! তুই থানার রাজা। তুই আমার মা-বাপ। তুই আমাকে বাঁচা! এখনও খাটিয়ায় বসে বসে দেখছিস কি? ওর মাথায় খুন সওয়ার রয়েছে। হাতকড়ি দিচ্ছিস না কেন এখনও? বাপরে বাপ!...”

বিরসার বউ ছুটে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল এখান থেকে। কনস্টেবল ত্নজন তাকে ধরে, তাড়া দিয়ে আবার বসাল। ‘থানার রাজা’ কথাটা দারোগাজীর কানে খুব মিষ্টি লাগে, এই গোলমালের মধ্যেও।

“খুন সওয়ার হয়েছিল কালকে বুঝলি! কাল যদি তোদের ত্নজনকে একসঙ্গে পেতাম তাহ’লে এই কুড়ুল দিয়ে কাটতাম ঠিকই। বাপের কাছ থেকে পাওয়া কুড়ুল—বাপের বংশের ইজ্জত বাঁচাবার ঠিকা আমারও যেমন, ওই কুড়ুলখানারও তেমনি। আমার চেয়েও বোধ হয় কুড়ুলখানার বেশী। দেখছিস না? নইলে ছিটকে অমন করে হাত থেকে বেরিয়ে যাবে কেন নিজের কাজ সারতে? চোখের নিমেষে, বোঝবার আগেই একেবারে উড়ে চলে গেল হাত থেকে; সাপে যেমন করে ছোবল মারে, বাঘে যেমন করে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম করে। সত্যি বলছি দারোগা, বিশ্বাস কর্; ছেলেটাকে আমি মারিনি। আমার যে ইচ্ছা হয়নি একবারও তা নয়; মিছে বলব না তোর কাছে---ছেলেটাকে শেষ করে দেবার কথা আমি কালকেও ভেবেছি। আমার বাপ ঠাকুরদার মুখে কালি দিচ্ছে ওই ছেলেটা। একথা আজ কাঠ কাটবার সময়েও ভাবছিলাম। আমার বাপ-ঠাকুরদারা উপর থেকে দেখছে, চোখে আঙুল দিয়ে ছেলেটাকে দেখাচ্ছে, ওটাকে শেষ করে দেবার কথা মনে পড়াচ্ছে,—এই সব কথা কুড়ুলটা হাত থেকে ফসকে যাবার আগের মুহূর্তেও

আমি ভাবছিলাম। কিন্তু আমি মারিনি। এত কথা তোর কাছে স্বীকার করছি, আর মারলে পরে সেই কথাটা তোর কাছে কবুল করতাম না? একেবারে বাচ্চা যে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুন্দর হাসে যে! মায়ের নাক খামচে নেয় যে! ওকে কি মারতে পারা যায়। কীই বা জানে, কীই বা বোঝে, অতটুকু রক্তর দলাটা! তা' কি পারা যায়! কিন্তু আমি না পারলে কি হবে! কুড়ুলটা শুনবে কেন? ওটা যে চলে আমার বাপ-ঠাকুরদার হুকুমে। আমার মনের চেয়েও এগিয়ে চলে। বললে বিশ্বাস করবি না, হাতের মধ্যে বেঁচে উঠে কুড়ুলটা শিঙ্গি মাছের মত পিছলে বেরিয়ে গেল হু-উ-ই দূরে। কাঠ কাটছিলাম উঠনে, ওখানে। ওখান থেকে এখানে ছুটে এল কুড়ুল, কি হচ্ছে বোঝবার আগেই। আমি নিজেই হাঁ হাঁ করে উঠেছি। এ কি হ'ল! দেখতে না দেখতে! কুড়ুলটা হাত থেকে পালাবার মুহূর্তেই আমি বুঝে গিয়েছি সেটার মতলব। জেনে গিয়েছি সেটা কোথায় যাচ্ছে; কিন্তু জানলে কি হবে। তার উপর আমার যে কোন হাত নেই। মানুষের সঙ্গে, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করা যায়; কিন্তু জিনিস একবার খেপলে কি তাকে সামলান যায়! অবিশ্বাস করিস না আমার কথা দারোগা। তীরধনুকে আমার হাতের নিশানা ভাল; কিন্তু হাজার নিশানা করেও ওই কাঠ কাটবার জায়গা থেকে কুড়ুল ছুঁড়ে এই বারান্দার বিড়ালের গায়ে আমি লাগাতে পারব না। আর লাগবি তো লাগ, একেবারে ঠিক মাথায়! একটা কথাও লুকাচ্ছিনা রে। সে সাহস আমার ছিল না। বাঘ ভাল্লুক মারবার চাইতেও অনেক বেশী বুকের পাটার দরকার হয় অতটুকু একটা দুধের বাচ্চাকে মারতে। সে বুকের পাটা আমার নেই।"...

বিরসার বউ সত্যিই খুব ভয় পেয়েছে। যত শুনছে তত তার ভয় বাড়ছে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। ময়না গাছটাকে কাটতে দেখেই বুঝেছিল যে, সে ধরা পড়ে গিয়েছে স্বামীর কাছে। কিন্তু এতটা সে ভাবেনি। নিজেকে ভাবত খুব চালাক। বিরসার

মাথায় যে খুন চড়ে আছে তা' সে আঁচ করতে পারেনি আজ সকালেও।···আর রক্ষা নেই তার, বিরসার হাত থেকে! মরা ছেলেটার চেয়েও নিজের প্রাণ বাঁচানর প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে হঠাৎ। আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা হচ্ছে দারোগার কাছে, নিজের সব দোষ স্বীকার করে—সোনাই সা'র সব কথা বলে। কিন্তু সমাজের সব লোক যে সম্মুখে বসে! বাধো বাধো ঠেকছে। তা' ছাড়া বিরসা কতটুকু জানে তাদের আশনাই সম্বন্ধে সেটা জানতে পারলে সুবিধা হত! দোষ স্বীকার করবার লোভ ছেড়ে, সে তার পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলে।

"না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না। ও আগা-গোড়া মিছে কথা বলছে।...."

"থাবড়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো! বারবার ওই একই কথা কি শানাচ্ছিস দারোগাকে! মিছে কথা কি? সোনাই সা'র কথাটা মিথ্যা? ময়নাগাছটা কাটলাম মিছামিছি? আমি কি পাগল না কি? তবে হ্যাঁ, ময়না গাছটা আমি কেটেছি রাগ করে। মিছে বলব না তোর কাছে দারোগা। নইলে অন্য গাছের ডাল দিয়ে কি আর কুড়ুলের হাতল হ'ত না? বুনো গাছ ঠিকই; কিন্তু ছাগলটা বাঁধতেও তো গাছটা কাজে লাগত! এই যে এতগুলো লোক উঠনে রোদ্দুরে বসে রয়েছে, ময়নাগাছটা থাকলে এরা কি একটু ছায়া পেত না? বুঝিতো; কিন্তু ও গাছটা না কাটলে যে সত্যিই চলছিল না। আর এখন সে কথা লুকিয়ে কি লাভ, ও ওই গাছটার উপর কাচা কাপড় শুকতে দিত মাঝে মাঝে। দেখাদেখি একদিন আমিও কাপড় শুকোতে দিলাম ময়নাগাছের উপর। সঙ্গে সঙ্গে দেখি ও আমার ধুতিখানা সেখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় মেলে দিল।

—কেনরে? তুললি কেন? বেশতো রোদ্দুর আছে এখনও ওখানে?

—পাতায় বড় ধূলো রে আজ। যা জোর হাওয়া গিয়েছে কাল। কাচা কাপড় ময়লা হয়ে যাবে।

নে বাবা, যা ভাল বুঝিস তাই কর!

আবার আর একদিন ওই ব্যাপার।

—কেনরে? তুললি কেন?

—আজ হাওয়া দেখছিস না; যেন ঝড় বইছে। এই হাওয়ার মধ্যে ময়নাগাছের কাঁটায় কি আর তোর ধুতি আস্ত থাকবে!

বেশ। যা বুঝোস তাই বুঝি! ভাবি, মেয়ে মানুষের খেয়াল। তখন বুঝতে পারিনি।

"না না দারোগা, এসব ওর বানানো কথা। আরও কত বলবে বানিয়ে বানিয়ে। বিশ্বাস করিস না একটা কথাও।"...

"দারোগা, তুই আগে সবটুকু শুনে নে। তারপর বুঝে দেখিস, এ আমার বানানো গল্প, না আমি সত্যি কথা বলছি।...আর এক দিনও দেখি ময়নাগাছের উপর কাপড় শুকোতে দিল। এই প্রহর বেলা তখন—গাছের দিকটায় রোদ্দ‚র নেই। এখানে ওখানে, বেড়ার উপর, দাওয়ার বাঁশে, ঘরের ছাঁচতলায়, চারিদিকে ভরা রোদ্দ‚র! তবু কাপড় শুকোতে দিচ্ছে ছায়ায়। ভাবলাম বলি; কিন্তু বলি বলি করেও বললাম না। খটকা লাগল। সেই রাত্রেই প্রথম সন্দেহ হয়। সোনাই সা'র সঙ্গে ওর আলাপ দরকারের চেয়েও একটু বেশী, এ কথাটা খেয়াল হ'ল সেইদিন। সোনাই সা'টা যে লোক ভাল না; আমাদের টোলার এত লোকতো এখানে রয়েছে; এরা সবাই বলবে একথা। এসব গত বছরের কথা। আমি কিন্তু মনে করে রেখে-ছিলাম। ময়নাগাছে কাপড় শুকোতে রোজ দেয় না। আবার ঝড়ের দিনেও ডালের সঙ্গে গেরো বেঁধে দেয়; পাতায় ধূলো জমে থাকলেও দেয়; রোদ না থাকলেও দেয়। দেখি। ভাবি। বোঝবার চেষ্টা করি। লক্ষ্য রাখি। মনে হয় যেন বুঝতে পারছি, অথচ ধরতে পারি না ঠিক, ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। কালও দেখি

কাপড় শুকোতে দিয়েছে গাছটার উপর অনেক কাল পরে। দিনে কাজে মন বসল না। রাতে ভাবতে ভাবতে ঘুম এল না। সারা রাত জেগে থাকব আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি। চোখ বুঁজে পড়ে আছি। ওটাও বুঝতে পারছি জেগে রয়েছে। পাশে শুয়ে। উশখুশ করছে। একবার আমার নাকের কাছে আঙ্গুল রেখে বোঝবার চেষ্টা করল আমি জেগে আছি কিনা। আঙ্গুলে তেলের গন্ধ পেয়েই আমি বুঝেছি। সাঁঝের বেলা চুলে তেল মেখেছে। কত বড় শয়তান। মটকা মেরে পড়ে আছি; কিন্তু কান খাড়া রেখেছি।...হঠাৎ ময়না-গাছতলায় শুকনো পাতার উপর শব্দ হল। পায়ের শব্দ। জন্তু-জানোয়ারের নয়। তাহলে খরখর করে শব্দ হ'ত। শুনেই বোঝা যায়। এ শব্দ মানুষের পায়ের—চাপা, কাটাকাটা শব্দ। সাবধানে টিপে টিপে পা ফেলবার শব্দ। চুলে তেল মাখা শয়তানটা তখন পাশে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে। বেশী চালাক কিনা! বুঝেছে আমি জেগে। নাক ডাকানর মানে, ও শুনেছে পায়ের শব্দটা। কুড়ুলখানা হাতে নিয়ে ঘরের ঝাঁপ খুলতেই নাক ডাকানী মেয়েটা কাশল। বোধ হয় সড় ছিল আগে থেকে যে কাশির শব্দ শুনলেই পালাতে হবে; কেননা আমি ঝাঁপ খুলতে না খুলতেই ময়নাতলার লোকটা ছুটে পালাল। অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাইনি; কিন্তু দুড় দুড় করে পায়ের শব্দ হল—স্পষ্ট শুনলাম। আগে থেকে সড় না থাকলে লোকটাইবা অন্ধকারে বুঝল কি করে ঝাঁপ খুলে কে বার হচ্ছে—আমি, না যার বার হবার কথা, সে। আমিও শব্দটার পিছু পিছু ছুটেছিলাম; কিন্তু সেও ওই শালা ময়নার কাঁটা পায়ে ফোটায় দৌড়ে পারলাম না লোকটার সঙ্গে। এই দেখ এখনও সেই কাঁটা ফুটে রয়েছে পায়ে। ও গাছের কাঁটাটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে।...সোজা গেলাম মুদির দোকানে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখি, আলো জ্বলছে মিটমিট করে; সোনাই সা নেই। ফেরেনি। দোকানে সোনাই সা একাই থাকে কিনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম তার জন্য। শেষকালে

ভোর রাত্রেও ফিরল না দেখে, বাড়ী ফিরি। ঘরের মধ্যে ঢুকিনি। দাওয়ায় বসে বসে কত কি ভাবি। যদি লোকটা সোনাই সা না হয়!...একটু ফরসা হতেই গেলাম ময়না গাছতলায়। ঠিক যা ভেবেছি! রবারের জুতোর দাগ! দোকানদার মানুষ; জুতো পরে কিনা—রবারের জুতো। মাথা গরম হয়ে উঠল। দিলাম ময়না গাছটাকে কেটে সাবাড় করে তখনই! আমাকে জেল দে, ফাঁসি দে, যা ইচ্ছা তাই কর; কিন্তু ছেলেটাকে আমি মারিনি।"

'না-না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না!...'

বিরসার স্ত্রী ওই একই কথা বারবার বলে চলেছে গ্রামোফোন রেকর্ডের মত। কিন্তু কথার পিছনে প্রাণ নেই। গলার স্বর মিইয়ে এসেছে; কথার ঝাঁজ মরেছে।

দারোগাজীই পড়েছেন মুস্কিলে। তাঁর মনে হচ্ছে যে বিরসা মিথ্যা কথা বলছে না; নিজেকে বাঁচিয়ে কথা বলবার চেষ্টা তার নেই। তবু মনে খটকা থেকে যাচ্ছে, একটা বিষয়ে; আর সেইটাই এই তদন্তের মুখ্য বিষয়। বিরসা ছেলেটাকে ইচ্ছা করে মেরেছে, না এটা একটা দৈবাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা মাত্র। বিরসার কথার এই অংশটা একটু কেমন কেমন যেন ঠেকে। এও কি সম্ভব? অসম্ভব অবশ্য পৃথিবীতে কিছু নেই। কিন্তু উপরওয়ালারাতো তা শুনবে না! তিনি নিজে চিরকাল এসব ক্ষেত্রে নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করেছেন! পুলিস সাহেব তাঁর উপর যত বিরূপই থাকুক, এখনও তিনি নির্ভীকভাবে নিজের বিবেক অনুযায়ীই কাজ করতে চান। তাঁর মন যা বলছে, যুক্তি বিবেচনা বলছে ঠিক তার উল্টো। বিরসার কণ্ঠস্বর আর চোখ-মুখের ব্যঞ্জনা ছাড়া আর সব তথ্য প্রমাণই তার বিরুদ্ধে। ঘটনাপরম্পরা এমনভাবে সাজানো যে, তাকে নির্দোষ বলে ভাবতে বাধে। হাত থেকে কুড়ুল ছিটকে যাওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু সেটা গিয়ে কি একেবারে ওই ছেলেটার মাথাতেই লাগবে! আর ও নিজেই স্বীকার করছে যে, ও ছেলেটাকে মারবার কথা

ভাবছিল তখন !···এতগুলো যোগাযোগ কি সম্ভব ?···না-না, লোকটা সত্যি কথা বলছে এই ধারণাটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই তার স্বপক্ষে। এই ক্ষীণ ধারণাটুকুর উপর নির্ভর করে কি কখনও পরিষ্কার বিবেকে, এটাকে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার কেস বলে রিপোর্ট করা যায় ?···

'না-না দারোগা, ওর আজগুবী গল্প একটুও বিশ্বাস করিস না। আগে হাতকড়ি লাগিয়ে দে ওর হাতে ; তারপর ওর কথা শুনিস।···'

দারোগাজী মন স্থিব করতে পারেন না। চৌকিদারকে হুকুম দিলেন সোনাই সা'র খোঁজ করতে। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে থেকে কে একজন যেন বলল যে, সোনাই সা পালিয়েছে ; আজ ওব মুদীখানার দোকান খোলেনি।

এতক্ষণে দারোগাজী বাইরে লোকজনেব দিকে তাকিয়ে দেখলেন। রাজপুতটোলার লোকরাও এসে জুটেছে যে লোকটা কথা বলল, সে পূরণ সিং-এর ছেলে সহদেও সিং। ঝুঁকে নমস্কাব করে সে দারোগাজীকে। ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসি ! মন খারাপ হয়ে গেল। ওই নমস্কার আর হাসির মধ্যে দিয়ে বোধহয় সহদেও সিং সকলকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে দারোগাজীর নগণ্যতার কথাটা।···লোক দেখানো নমস্কাব ! ও বোঝাতে চাচ্ছে যে, পূবণ সিং-এর স্থান থানাব মধ্যে দারোগাজীর চেয়েও উঁচুতে !···ঠোঁটেব কোণের হাসিটা তাচ্ছিল্যো ভরা !···

বেশ এতক্ষণ কর্তব্যের মধ্যে ডুবেছিলেন। আর এখন পূবণ সিং-এব কথাটা ভুলে থাকবার জো নেই ! হাজাব কাজে ডুবে থাকলেও। সহদেও সিং মনে পড়িয়ে দিয়েছে সেই দিনকার অপমানের কথাটা। ভোখরাহা গ্রামের এই সব লোকজনের চোখে সেইদিন থেকে তিনি কত ছোট হয়ে গিয়েছেন ! সঙ্কোচে তিনি রাজপুতটোলার লোকের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। গম্ভীর হয়ে তিনি লেখাপড়া, মাপাজোখা, সাক্ষ্য প্রমাণে মনোনিবেশ করলেন।

তদন্তের কাজ শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সাক্ষ্য প্রমাণ সব বিরসার বিরুদ্ধে। মনের সংশয়টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল। কুড়ুলটা হাত ফসকে অমনভাবে ছেলের মাথায় লাগার কথাটা সত্যি ব'লে ভাবতে পারলে তিনি তৃপ্তি পেতেন।

এত দেরি হবে এখানে তা তিনি ভাবেননি। এগারো মাইল পথ তাঁকে যেতে হবে সাইকেলে, অন্ধকারের মধ্যে। এই মেদবহুল শরীর নিয়ে, এত পরিশ্রম আর আজকাল পোষায় না; কিন্তু পরের চাকর যে! যাক, তবু ভাল যে রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার সময়টাতে তিনি বাড়ী পৌঁছে যাবেন! এখানে আর তিনি এক মিনিটও দেরি করতে চান না। শবদেহ আর আসামীকে নিয়ে যাবার ভার কনস্টেবলদের উপর দিয়ে, তিনি উঠলেন।

গ্রামের লোকরা তাঁকে ঘিরে ধরে সকলেই তাঁর সান্নিধ্য পেতে চায়। এতক্ষণ তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন—এখন তাঁর অবসর—মাতব্বরেরা সকলেই চায় থানার মালিকের সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত পরিচয় করে নিতে। ঝুঁকে সেলাম করছে; দারোগাজী শুধু একবার তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের ধন্য করুন! সবচেয়ে আগে দাঁড়িয়ে পূরণ সিং-এর ছেলে সহদেও সিং। গ্রামের লোকে খাতির করে তাকে দারোগাজীর সবচেয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার অধিকার দিয়েছে। পুলিস সাহেব যাকে মোটর গাড়ীতে নিজের পাশে বসতে দেয়, গ্রামের মধ্যে তার খাতিরই আলাদা। সে হেসে এগিয়ে এল।

'দারোগাজী এখনই চললেন? এই গরীবের বাড়ীতে একটু পায়ের ধূলো দিলে হ'ত না! অনেকটা পথ যেতে হবে; কখন পৌঁছবেন; যদি একটু জলটল খেয়ে যেতেন...... !'

'না-না! এ সময় জল-খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই!'

'আমার বাবা আপনাকে দেখলে খুশী হতেন। আজ হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন আপনাদের আশীর্বাদে। তবে হাতের ব্যাণ্ডেজটা এখনও খুলে দেয়নি। একটু দেখা করে গেলে হ'ত না?'

পূরণ সিং! ফিরে এসেছে? সহদেও সিং বুক ফুলিয়ে এসে নিমন্ত্রণ করবার ছলে, তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই দিনকার কথাটা! লোকগুলো নিশ্চয়ই মজা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! এদের সম্মুখে সাহেব সেদিন তাঁকে নবাব সাহেব বলে গালাগালি দিয়েছিল! মনের নীচে থিতিয়ে পড়া অপমানের গ্লানিটুকু ঘেঁটে উঠেছে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করে। এখান থেকে কোন রকমে বার হতে পারলে তিনি বাঁচেন!...

'না-না! অনর্থক রাত করে লাভ কি!'

দরকারের চেয়েও কড়া হয়ে গেল কথাটা। মনের আলোড়ন চাপবার চেষ্টায় তাঁর খেয়ালও নেই যে অকারণে সাইকেলের ঘন্টা বাজিয়ে চলেছেন তিনি। বিরসার স্ত্রীর চিৎকার, এতগুলি লোকের 'আদাব', 'সেলাম', 'প্রণাম', 'নমস্তে'র ঘটা কিছুই কানে যাচ্ছে না তাঁর। পূরণ সিং-এর কথাটাই সারা মন জুড়ে রয়েছে। অন্ধকারে সাইকেলের সম্মুখের তিন-চার হাতের বেশী দূরের কোন জিনিস দেখা যায় না। এক রকম আন্দাজে সাইকেল চালানো। খানা-ডোবায় ভরা গ্রামের রাস্তায় অনবরত হোঁচট খাচ্ছেন। একেবারে প্রাণ হাতে করে চলা। তবু তিনি জোরে জোরে সাইকেল চালাচ্ছেন। দুঃসহ ভোখরাহা গ্রামটাকে তিনি তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে চান। তারপর না হয় সাইকেলের গতি কমিয়ে দেবেন। পূরণ সিং তাঁর জীবনটাকে দুর্বহ করে তুলেছে। পুলিশসুপারিন্টেণ্ডেন্ট আবার কোন্‌দিন তার আদরের দুলালকে দেখতে না চলে আসে হুট করে! এলে নিশ্চয়ই বিরসা মাঝির কেসটা সম্বন্ধেও খোঁজ খবর নিয়ে যাবে; একটু সতর্ক থাকা দরকার। শোনা গিয়েছিল পূরণ সিংকে তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হবে।—এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেল কি করে? কী পরমায়ু বুড়োটার! মরেও না! ওর দলের লোকেই ওকে খুন করতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা এখনও ফেরার রয়েছে, তারা কি আবার একবার ওকে মারবার চেষ্টা করবে না? সুযোগ-সুবিধা পেলে করবে ঠিকই। এবার থেকে সে আর সহদেও সিং পুলিশ

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে থানার দারোগার বিরুদ্ধে কত রকম খবর দেবে, তার ঠিক কি! কিন্তু তাই ব'লে কি চোরডাকাতের মন জুগিয়ে চলতে হবে না কি? তেমন বান্দা রামভরোসা দারোগাকে পাওনি। একবার বাগে পেলে হয় পূরণ সিংকে! তার বিরুদ্ধে কিছু পেলে তিনি ছাড়বেন না! নীচে থেকে জোর কলমে লিখে চালান তো করে দেবেন সদরে; তারপর উপরওয়ালারা যা ইচ্ছা হয় করুকগে! এ থানা থেকে বদলি হ'বার আগেই তিনি একবার পূরণ সিংকে দেখে নেবেন।

এ কি! হঠাৎ খেয়াল হ'ল। এতদূর এসে পড়েছেন! রাজপুত-টোলার ইঁদারাটাই হবে বোধহয়! অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না··· এক হাঁটু পাঁক রাস্তার উপর। ডান দিকের অপরিসর শুকনো জায়গাটার উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হবে। সাদা কাপড় পরা কে যেন সম্মুখে!—দু'জন স্ত্রীলোক—কলসী নিয়ে!···তিনি আগে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাননি। স্ত্রীলোক দুটির ওখান থেকে সরে যাবার উপায় নেই আর। তিনি এক ঝাঁকি দিয়ে আচমকা বাঁ দিকে সাইকেল ঘোরালেন। ইঁদারাটার বাঁদিক দিয়ে তিনি চলে যেতে চান। মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল—অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না—কিসের সঙ্গে যেন জোরে ধাক্কা লাগল সাইকেলের। ছিটকে পড়ে গেলেন দারোগাজী সাইকেল থেকে। আরও কি একটা যেন ছিটকে পড়ল মাটিতে। ভারী জিনিস! মানুষ!···

'বাপরে বাপ! মেরে ফেলল রে!'

লোকটা পরিত্রাহি চিৎকার করছে। পূরণ সিংয়ের গলা! আলো নিয়ে কে একজন ছুটে আসছে।···আরও একজন স্ত্রীলোক ছুটে এল। ···আরও একজন। চেঁচামেচি।···হট্টগোল। পাড়ার মেয়েরা ভয় পেয়েছে—পূরণ সিংকে দলের লোকেরা আবার জখম করল নাকি?··· রাজপুতটোলার পুরুষ মানুষরা ফিরছিল বিরসা মাঝির বাড়ী থেকে। তারা দূর থেকে সাড়া দিচ্ছে। আসছি, আসছি।······তাদেরই মধ্যে থেকে কেউ বুঝি একটা খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিল। গ্রামে

ডাকাত পড়লে এই করাই নিয়ম; দূর গ্রামের লোকেরা জানতে পারে; সারা গ্রাম আলো হয়ে যায়। রাজপুতটোলার লোকদের লাঠির জোর আছে—ডাকাতকে ভয় পায় না। তারা ছুটে আসছে লাঠি বাগিয়ে। ভর সন্ধ্যাবেলা—দারোগা কনস্টেবল গ্রামে—এরই মধ্যে এসেছে পূরণ সিংকে মারতে!…বুকের পাটা কম নয়! তারা যখন এসে পৌঁছল তখন দারোগাজী বুড়ো পূরণ সিংকে কোলপাঁজা করে তুলে, দড়ির খাটিয়াখানার উপর আবার শুইয়ে দিচ্ছেন। আঘাত গুরুতর নয়, তাই রক্ষা। নইলে রাজপুতটোলা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া শক্ত হ'ত।

…কি করে এ জিনিস সম্ভব হ'ল? সেই কুড়ুলখানার মত, তাঁর সাইকেলখানাও কি মনিবের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করল নাকি? কে জানে! ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায় না।

…অনেক রাত্রিতে যখন রামভরোসা দারোগা বাড়ী ফিরলেন, তখন তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে, বিরসা মাঝির কেসটাতে আকস্মিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেবেন।

ওই বুক থেকেই সেটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল পরসাদীকে, নদীতে ফেলে দেবার জন্য। অমনভাবে যেটা চলে যায়, সেটাকে পুঁততে নেই—তাই নদীগর্ভে ফেলা।

বাড়ীর মধ্যে থাকবার সময় পরসাদী কাঁদেনি। চোখের কোণায় জল এলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে লুকিয়ে মুছে নিচ্ছিল, পাছে আবার মনচনিয়া দেখে ফেলে সেই ভয়ে। মনচনিয়ার মুখের দিকে এতক্ষণের মধ্যে একবারও তাকায়নি। চোখাচোখি হলে লজ্জা পাবে। এইসব সময় কি তাকান যায় কারও দিকে। একে তো শোকে, লজ্জায় মরে রয়েছে মনচনিয়া; এখন কি তার দুঃখের বোঝা বাড়ান উচিত! পরসাদী কেঁদেছিল বাড়ীর বাইরে গিয়ে।

এতকাল ধরে সবাই জানত যে তার স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে না। কত তুকতাক, মাদুলি, মানত, ওষুধ-বিষুধ এর জন্য! মরবার পর মুখে জল পাবার আকাঙ্ক্ষা কার না থাকে। তারপর যবে থেকে জানতে পারল যে, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, তবে থেকে অধীর হয়ে দিন গুনেছে। কী করবে ভেবে পায় না মনচনিয়াকে নিয়ে। কত জিজ্ঞাসা। কি খেতে ভাল লাগে? ছেলে হবে না মেয়ে হবে? কার মত দেখতে হবে? নড়ছে নাকি? পোড়ামাটি চিবুতে ইচ্ছে করে? আরও কত জল্পনা কল্পনা। চামারণীর সঙ্গেই কত কথা ফিসফিস করে। পাড়ার লোকে তার আধিক্যেতা দেখে হাসাহাসি করেছে।

...তারপর বুধে বুধে চৌদ্দ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—এ সতর দিন তো হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। সতর দিন পরে যাঁর জিনিস তিনি টেনে নিলেন কাছে। মানুষ কতটুকু কি করতে পারে!...যাবে না কেন—

যায়। কতরকমে যায় কত লোকের ছেলে।...গুড়ের নাগরির মধ্যে ডুবে ছেলে যেতে শুনেছে; গরম দুধের কড়ার মধ্যে পড়ে ছেলে যেতে দেখেছে।...কিন্তু এরকমভাবে যাওয়া!...আহা রে! ওই তো এক রত্তি রক্তর দলা!...একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস নেবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ দুটো বড় হয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল।...আহা রে!...

...চাটছিল বুঝি।...ভয় পেতে শিখবার আগে, বিপদ কি তা জানবার আগে।. মায়ের বুকের ধস নেমেছিল হঠাৎ।...জগদ্দল ননীর তালের নীচে বুকচাপা আঁধার। সে আঁধারের মধ্যে দিয়ে শেষ কান্নাটুকুও বার হতে পায়নি!...

মনচনিয়া জানতে পারল অনেক পরে। কতক্ষণ কে জানে।... ওখানটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে কেন?...কখন কখন অমন হয় ওখানটায়। ঘুমের ঘোরে কম্বলখানা গায়ের উপর ভাল করে টেনে নেবার সময়ও মনে পড়েনি, অন্য একটা প্রাণীর কথা। এমনিই ঘুমকাতুরে সে।... তবু ওখানটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে কেন? 'কালীস্থান'-এ ঘণ্টা বাজছে; ভোর হবার আর দেরি নেই। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সে।... কাঁথা ভিজলে তো এরকম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে না কম্বলের তলায়!... এ যেন অন্যরকম অন্যরকম লাগছে! কেঁপে উঠেছিল বুক। চারটে দেশলাই-কাঠি খরচ হল লণ্ঠনটা জ্বালতে। লণ্ঠনের শিষ বাড়িয়ে, বিছানার দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষীণ আশাটুকু নিভে যায়। তার চীৎকারে পরসাদী ওঠে।...কিন্তু আর কি ওই দেহটুকুতে উত্তাপ ফিরে আনা যায়! কিছুতেই কিছু হল না। সতর দিনের মাংসপিণ্ডটাকে বুকের জাঁতায় চটকে পিষে ফেলতে আর ভয় নেই মনচনিয়ার। চোখের জলে ওই বুকই ভাসে।

মনচনিয়ার বুড়ী কুকুরটা খানিক দূর পরসাদীর সঙ্গে গিয়ে ফিরে এসেছিল। এসে বসেছিল মনচনিয়ার পাশে। রঙ কালো, তাই কুকুরটার নাম কারিয়া। কারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার

জলভরা চোখের দিকে, ছড়ান চুলের বোঝার দিকে। বুড়ী কুকুরটা অনেকদিন এদের সংসারে আছে। বোঝে সব। ঠিক বাড়ির লোকের মত।

মনচনিয়া কুকুরটাকে নিয়ে এসেছিল বাপের বাড়ি থেকে দ্বিরাগমনের পর আসবার সময়। ঠিক নিয়ে আসেনি; আপনা থেকে চলে এসেছিল কারিয়া তার সঙ্গে। সে কি আজকের কথা! তার বিয়ে হয়েছিল চার বছর বয়সে; দ্বিরাগমন হয় বিয়ের পনর বছর পরে। পরসাদী দ্বিরাগমনের টাকা জমিয়ে, শ্বশুরের কাছে বার বার খবর পাঠায়। শ্বশুর সাড়া দেয় না; কেবল দেরি করে। লোকে দশ কথা বলে এ নিয়ে। মনচনিয়া তখন গ্রামের তহশীলদার সাহেবের বাড়িতে ছেলেপিলে রাখবার 'দাই'-এর কাজ করে। লোকে বলে বাপ মেয়ের রোজগার খেতে চায়—আর শুধু ঝিগিরির মাইনের রোজগার নয়। শুনে পরসাদীর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বয়সের গরম, তার উপর টাকার গরম। তেল দিয়ে পাকানো লাঠি নিয়ে সে যায় শ্বশুরের কাছে। ঝগড়াঝাটি, লাঠালাঠি করে সে তার হকের বউকে নিয়ে আসে সেখান থেকে। গাঁয়ের বাইরে এণ্ডির ক্ষেতের পাশে যখন গরুরগাড়ি পৌঁছেছে, তখন প্রথম নজরে পড়ল যে, কালো কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

"কাদের কুকুর রে?"

এই হচ্ছে প্রথম কথা পরসাদীর, মনচনিয়ার সঙ্গে।

"আমার।"

অতি ভয়ে ভয়ে বলা।

"তোর!"

মনচনিয়ার চেহারাটা বিশাল হলে কি হবে। ভয় পায়। কড়া স্বামী। লড়াই করে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করে—

"তুলে নি ওটাকে?"

"থাকতে পারবে তো ?"

"তা পারবে।"

চলন্ত গাড়ি থেকে কুকুরছানাটাকে টেনে উপরে তোলবার চেষ্টা করতেই স্বামী বলে—"আহা করিস কি! তুই কি অত ঝুঁকতে পারিস। আর একটু সম্মুখের দিকে সরে বস।"

গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে মনচনিয়া কুকুরটাকে টেনে তোলে গাড়িতে। দেখিয়ে দিল যে, মোটা হলেও সে অকেজো নয়। কেউ তার মোটাসোটা চেহারা নিয়ে কিছু বললেই কুণ্ঠিত হয়ে সে গায়ের কাপড় সামলে নেয়, দেহভার লুকোবার জন্য। প্রথম দিনই পরসাদী এ জিনিস লক্ষ্য করেছিল।

"কত ওজন মাথায় নিয়ে ঘুরতে পারিস ?"

"এক মণ তো পারবই।"

"এক মণের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে রোদের মধ্যে তিন ক্রোশ ঘুরে বেড়াতে পারবি ?"

আবার গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে, মনচনিয়া জানায় যে, সে পারবে। চোখমুখে অপ্রস্তুতের ভাব সুস্পষ্ট। কথাবার্তায় সাবধান হয়ে যায় পরসাদী সেই থেকে। "হরদা-হাট আমাদের ওখান থেকে তিন ক্রোশ। সেখান থেকে পাইকারী দরে তরি-তরকারি কিনে এনে শহরে বিক্রি করি আমরা।"

এই হয়েছিল প্রথম কথাবার্তা তার স্বামীর সঙ্গে। তার কুকুর, আর তার মেদবহুল দেহটাকে নিয়ে কথা। স্বামী যতই হাট বাজার আর তরিতরকারির কথা বলুক, মনচনিয়া বুঝতে পারে কথার ইঙ্গিতটা কোনদিকে।

এখানেই শেষ হয়নি। আরও খানিক দূর এসে দেখা তহশীলদার সাহেবের সেপাই দুটোর সঙ্গে। তারা অপেক্ষা করছিল পরসাদীর জন্য। মালিকের বোধ হয় হুকুম ছিল মারধোর করবার। কিন্তু তারা অল্পতেই রেহাই দিল। মালিকের দুর্নাম করবার জন্য গালিগালাজ

দিয়ে শেষকালে রসিকতা করে গেল—"ছু দুটো কালো কুত্তী নিয়ে চললি এখান থেকে—আমাদের গ্রাম যে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। মোটা কুত্তীটা কিন্তু রোগা কুত্তীটার চাইতে খাবে অনেক বেশী। দেখিস।"

হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে সেপাই দুটো। এ ঘটনা ঘটেছিল দশ বছর আগে। তারপর থেকে কুকুরটা এখানেই থাকে। সেই থেকে, মনচনিয়ার কথা মনে হলেই, তার কালো কুকুরটার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে এখানকার লোকের। ইঁদারাতলায়, হরদাহাটে, গেরস্ত বাড়িতে যেখানে মনচনিয়া যাবে, সেখানেই কুকুরটা তার পিছনে পিছনে যাবে। শুঁটকী কারিয়া আর ধুমসী মনচনিয়ার কথা ছেলেপিলেরা এক নিশ্বাসে বলে হাসাহাসি করে। কেন যে ছেলেপিলেরা এত নিষ্করুণ হয় কে জানে। হয়ত তরকারির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে আসছে মনচনিয়া রাস্তা দিয়ে, ছেলেদের মার্বেল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল। একজন সুর করে চেঁচায়—'ম-ন-চ-নি-য়া'। আর একজন সুর মিলিয়ে বলে—'ল-দ্‌-ব-দি-য়া'। মনচনিয়া, লদ্‌বদিয়া॥ মনচনিয়া, লদ্‌বদিয়া॥ কারিয়া লেজ নীচু করে নিয়েছে। মনচনিয়া কাছে এসে গেলে, দলের সব চেয়ে দুষ্টু ছেলেদুটো পথের দু' পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। একজন মনচনিয়ার এপাশে, আর একজন ওপাশে। তার চলনের নকল করে হাঁটছে তারা। দেহভঙ্গির তালে তালে সুর ওঠে—'লদর, বদর॥ লদর, বদর॥ লদর, বদর॥...'

মরমে মরে যায় মনচনিয়া। জিভের ধার তার কম নয়। অন্য কোন বিষয় নিয়ে এরা তার পিছনে লাগতে এলে, সে পালটা জবাব দিতে ছাড়ত না। গালাগালি, চীৎকার করে এমন অনর্থ বাধাত যে, ছেলেরা পালাবার পথ পেত না; কিন্তু এ যে তার দেহের বেঢপ গড়ন নিয়ে কথা। মুখে ফুটে ওঠে অপ্রস্তুতের হাসি। গায়ের কাপড় সামলে নেবার পর্যন্ত উপায় নাই, দু হাত দিয়ে মাথার ঝুড়িটা ধরে

রয়েছে বলে। ছেলেদের হাত থেকে রেহাই পাবার পর খানিক দূর গিয়ে কারিয়ার লেজ আবার খাড়া হয়ে ওঠে। ছেলেদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কুকুরীটা দু'বার ডাকে ঘেউ ঘেউ করে। গোনা দু'বার। তারপর আবার একটা অতিপরিচিত গন্ধ নাকে নিতে নিতে পথ চলতে আরম্ভ করে।

মনচনিয়ার এই কুণ্ঠিত ভাবটা খানিকটা কেটেছিল গত কয়েক মাস থেকে। নূতন সম্ভাবনায় পৃথিবীর রঙ যখন বদলে যায়, তখন ভারী বোঝাও হাল্‌কা লাগে, বেমানান জিনিসও মানানসই হয়ে ওঠে, মনের জোর বাড়ে। তার সৌষ্ঠবহীন দেহের একটা মানে তবু সে এতদিনে খুঁজে পায়।...কিন্তু এ আর ক'দিন !

সতর দিনের রাজপাট শেষ হয়ে গেল মনচনিয়ার।...যে অঙ্গ নিয়ে তার চিরকালের অস্বস্তি, যে অভিশাপের বোঝার কুণ্ঠায় সে লোকের কাছে মাথা হেঁট করে থাকে সব সময়, সেইটাই এতদিন পর তার সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছে।...শত্রু !...শত্রু !

পা ছড়িয়ে বসেছে মনচনিয়া ঘরের দাওয়ায়। বুড়ী কুকুরটা তার পা চাটছে। কারিয়ার চোখের কোণায় ওটা জল না পিচুটি ঠিক বোঝা যায় না। নিজের অজানতেই বুঝি মনচনিয়ার হাত চলে গিয়েছে কুকুরীটার গায়ে। হাত বোলাচ্ছে পিঠে, পেটে বুকে। পিঠের খরখরে লোমগুলো আঙুলের ফাঁক দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। বুকের রোঁয়া এর চেয়ে নরম। পাঁজড়ার হাড়গুলো হাতে বেঁধে। শুকনো বুকের উপর আঙুল চালাতে চালাতে সে ভাল করে সেদিকে তাকিয়ে দেখল। আঁচিলের মত ছোট ছোট। একটু চেষ্টা করে না দেখলে কালো লোমের মধ্যে প্রথমটায় নজরে পড়ে না। কারিয়ার কানের এঁটুলি-গুলোর চাইতেও ছোট ছোট বোঁটাগুলো! বয়স হওয়ায় গত বছর থেকে বাচ্চা হওয়া বন্ধ হয়েছে বুড়ী কুকুরটার।...কিন্তু এও ভাল।...শতগুণে ভাল !

কারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—একবার মনচনিয়ার মুখের

দিকে, আর একবার ঘাড় কাত করে তার হাতের আঙুলের দিকে। বোঝবার চেষ্টা করছে। ঠিক আদরের মত লাগছে না তো, মনচনিয়ার চোখ-মুখের ভাব দেখে। তবে? বুকের বোঁটাগুলোতে সুড়সুড়ি লাগছে যে তার।

দুঃখ তো আছেই; কিন্তু এমনভাবে পেটের ছেলে চলে যাওয়ার সে যে কী লজ্জা, ব'লে বোঝানো যায় না। সবাই যে তারই কথা আলোচনা করছে সরকারী ইঁদারা-তলায়। কত কী যে বলছে। বাড়ী থেকে বেরুতে সাহস পায় না মনচনিয়া। তবুও কি শান্তি আছে! পাড়ার লোকে আসে তাকে সান্ত্বনা দিতে। সান্ত্বনা না ছাই! সব বোঝে সে। চাদর মুড়ি দিয়ে সে চাটাইএর উপর শুয়ে থাকে, কেউ বেড়াতে এলে। যা ইচ্ছা বলে যাও, সে কোন কথার জবাব দেবে না। পরসাদী বাড়িতে থাকলে, প্রতিবেশিনীদের বারণ করে মানচনিয়াকে জ্বালাতন করতে। এক বুড়ী সহানুভূতি জানাতে গিয়ে মনচনিয়ার গাঢ় ঘুমের কথা তুলেছিল। তাকে তাড়া দিয়ে থামিয়ে দেয় পরসাদী। কারিয়া চাটাইখানার পাশে অষ্টপ্রহর বসে থাকে। চেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেখলেও বার দুয়েক ঘেউ ঘেউ করে ডেকে নিজের বিরক্তি জানিয়ে দেয়।

স্ত্রীর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক আন্দাজ পেল পরসাদী, তার একটা কথা থেকে। মাটির দিকে তাকিয়ে, অতি কুণ্ঠার সঙ্গে সে স্বামীকে বলেছিল সরকারী ইঁদারা থেকে জল এনে দিতে। খাওয়ার জল? মনচনিয়া চুপ করে থাকে। স্নানের? মনচনিয়ার চোখে জল এসে গিয়েছে। স্বামীকে কখন সরকারী ইঁদারা থেকে স্নানের জল আনতে বলতে পারে মেয়েমানুষে! একে মোটা মানুষ; স্নান না করলে তার চলে না। তার উপর গায়ে দুধ-পচা গন্ধ। নিজেরই গা ঘিন ঘিন করে। লজ্জার মাথা খেয়ে তাই সে স্বামীকে স্নানের জল আনতে বলেছিল। ইঁদারা-তলায় লোকজনের মধ্যে জল আনতে যাবার লজ্জা যে আরও অনেক বেশী। পরসাদী মাটির কলসীটা

নিয়ে বেরুচ্ছিল। মনচনিয়া বালতিটা হাতের কাছে আগিয়ে দেয়—পুরুষমানুষে সরকারী ইঁদারা থেকে কলসী করে জল নিয়ে এলে পাড়ার লোকে কি বলবে!

সহজ বুদ্ধিতে পরসাদী বোঝে, স্ত্রীকে এখন একটু অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টা করা উচিত সব সময়। উঠনভরা শাকসব্‌জির গাছ—মনচনিয়ার নিজ হাতে পোঁতা সেগুলোরও যদি একটু দেখাশোনা করে তাহলে মনটা ভাল থাকে। কিন্তু করে কই। বারান্দায় বসে বসে কি ভাবে দিনরাত্র সে-ই জানে। ভোরে উঠে সে প্রত্যহ মাচা থেকে সীম, বরবটি পেড়ে রাখত বাজারে নিয়ে যাবার জন্য। এ তিনদিন মনচনিয়া সীম পাড়তেও ভুলে গিয়েছে।

সময় পেলেই পরসাদী স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে তাকে একটু অন্যমনস্ক রাখতে চায়; কিন্তু আরম্ভ করবার একটু পরই আর কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলতে ইচ্ছে করে, যেটা চলে গিয়েছে সেইটার কথা; কিন্তু সে কথা যে বলতে মানা। অন্য গল্প করতে গেলেও বাধা এসে পড়ে অজানতে। তরিতরকারির বাজার দর নিয়ে গল্প আরম্ভ করাই ছিল তাদের চিরকালের অভ্যাস। পরসাদী হয়ত আরম্ভ করল সীমের দরের কথা। "এখন দরটা যাচ্ছে ভাল। আর এক মাস পরে কে পুঁছবে কুকুরের কানের মত শক্ত শক্ত সীম। 'সাতপুতিয়া' (সাতপুত্তুর) সীমের গাছেই লাভ বেশী; অফুরন্ত ফলন; থোবা থোবা ফলে; এক এক থোবায় থাকে সাতটা করে। উঠনের সীমগাছটা সেই দশহরার আগে থেকে ফল দিচ্ছে—মনে আছে তো সেই যেদিন খগরিয়া-হাটের দশহরার মেলা থেকে তোর জন্য দহিবড়া?…'

বলতে বলতে থেমে যায় পরসাদী। কথাটা তোলা ঠিক হয়নি। ছেলেটা তখন পেটে। স্ত্রী খেতে চেয়েছিল ওখানকার দহিবড়া।

"হ্যাঁ হ্যাঁ অসময়ের শাকসব্জিতেই লাভ। সীম গাছটা এত আগে থেকে ফলতে আরম্ভ করেছে এবার; পুরনো গাছ বলে। গত বছরের

গাছ। তুই তো তুলে ফেলতেই চেয়েছিলি মড়ুঞে গাছটাকে। আমার কথাতেই তো বৈশাখ মাসে জল দিতে আরম্ভ করলি। বলেছিলাম কিনা, বল ?”

আবার একটা কেমন কেমন যেন ভাব মনচনিয়ার চোখমুখে দেখতে পেয়ে পরসাদীকে থামতে হয়।

…“লাউগাছটার কি তেজ হয়েছে দেখেছিস। চাল ছেয়ে গিয়েছে। কী মোটা মোটা ডগাগুলো—বুড়ো আঙুলের চাইতেও মোটা। রোজ ভাতের ফেন ফেলিস কিনা গাছের গোড়ায়, তাই ওটার অত জোর। অত বাড় হলে কি গাছে ফল থাকে। ওর ডাঁটা কেটে কেটে বেচে ফেলাই ভাল বোধ হয়। দেখছিস না, কেবল জালি পড়ছে আর পচে যাচ্ছে—জালি পড়ছে আর পচে যাচ্ছে।”…

কি আবার বলে ফেলল সে। স্ত্রীর মুখখানি হঠাৎ অমন কাঁচুমাচু হয়ে গেল কেন ? মাঝপথে কথা ফুরিয়ে গেল পরসাদীর। সে উঠে পড়ে। এত সামাল দিয়ে দিয়ে কি কথা বলা যায়।

সেলাই নিয়ে বসলে হয়ত একটু অন্যমনস্ক থাকবে। স্ত্রীর কুর্তার জন্য খানিকটা ছিট নিয়ে এল পরসাদী, তরকারি বেচে ফেরবার সময়। মনচনিয়া দেখে বলে, “এ কাপড়গুলো কাচলে পরে বড্ড ছোট হয়ে যায়।”

“অত আঁট আঁট জামা করিস কেন ; একটু ঢিলে সেলাই করলেই পারিস।”

কিছু ভেবে বলা নয়। তবু মনচনিয়া নীচের দিকে চোখ নামিয়ে নেয়। কত কি গল্প করবে, ভেবে ঠিক করে এসেছিল পরসাদী। সব গুলিয়ে যায়, স্ত্রীর ঐ অপরাধীর ভাবটা লক্ষ্য করে।

তার চেষ্টার ত্রুটি নাই। পরের দিন সে ফিরল এক কুকুরছানা নিয়ে। এইরকম একটা কিছু পেলে হয়ত মনচনিয়ার মনটা একটু ভাল থাকবে—একেবারে খালি খালি লাগছে কিনা এখন। কুকুর-ছানাটা খুবই ছোট—সবে চোখ ফুটেছে। “ও আবার কি নিয়ে এলি ?”

"কারিয়াটা বুড়ী হয়েছে। কবে মরে যাবে তার ঠিক কি। এখন থেকে একটা নতুন কুকুর পোষা ভাল। পথের ধারে শীতে কুঁই কুঁই করছিল। উঠিয়ে নিয়ে এলাম।"

মনচনিয়া সেদিন কাজে বেরুবার যোগাড় করছিল। আর কতদিন বাড়িতে বসে থাকবে। বাড়ীতে বসে থাকলে কি তাদের মত অবস্থার লোকের চলে। এরই মধ্যে স্বামী কুকুরছানা নিয়ে এসে হাজির।

...ফ্যাসাদ! এতকাল 'যখন কারিয়ার বছর বছর বাচ্চা হ'ত সাতগণ্ডা করে, তখন কুকুরের বাচ্চা পোষবার কথা খেয়াল হয়নি? কত শিয়ালে খেয়েছে, কত পাড়ার ছেলেপিলেরা নিয়েছে। যতই পাতকুড়নো খেতে দাও, কুকুর পোষবার খরচ আছে তো! শুধু পাত কুড়নো খেতে দিলে কি কুকুর বাড়িতে থাকে! এক গেরস্তর আঁস্তাকুড় থেকে আর এক গেরস্তর আঁস্তাকুড়ে টহল মেরে বেড়ায় অষ্টপ্রহর।

তবু স্বামী যখন নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছে, তখন এটাকে বাড়ীতে জায়গা দিতেই হয়।

ঝুড়ি নামিয়ে মনচনিয়া কুকুরছানাটাকে হাতে করে নেয়। বাড়ি থেকে বেরুতে তার লজ্জা লজ্জা করছিল। যাক, তবু একটু সময় পাওয়া গেল কুকুরের বাচ্চাটা আসায়। একবেলা দেরি করবার একটা অছিলা পেয়ে সে বাঁচে।

একেবারে বাচ্চা। পাশে বসালে কোলের উপর উঠে উঠে আসে। নাক বাড়িয়ে বাড়িয়ে শুঁকছে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে। কাপড়ের মধ্যে মুখ গুঁজতে চায়। লিকলিকে জিভের ডগা দিয়ে আঙুল, তেলো, হাতের চামড়া চেটে চেটে দেখছে। মনচনিয়ার গায়ের গন্ধটা তার মনোমত। দুধের টক টক মাতা-মাতা গন্ধটা তার চেনা। হারিয়ে যাওয়া গন্ধ আবার ফিরে পাচ্ছে কুকুরছানাটা। সহজ-প্রবৃত্তিতে বুঝছে যে এই গন্ধটাই তাকে উৎস-ধারার সন্ধান দেবে।

"বাবারে বাবা! এক মিনিটও নিশ্চিন্দি নেই। চুপটি করে বস্ এখানে।"

কোল থেকে নামিয়ে মনচনিয়া বাচ্চাটাকে চেপে পাশে বসাল।

কারিয়ার গলার মধ্যে দিয়ে একটা শব্দ বার হল—ঘর্-র্-র্। নূতন আগন্তুকের কাণ্ডকারখানা তার অপছন্দ। আগগোড়া ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি রকম দাঁড়াল, সেটারও আন্দাজ করে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। একবার কুকুরছানাটার কাছে গিয়ে সেটার গা শুঁকে নেয়। গন্ধর মধ্যে কি পেল না পেল সে-ই জানে। একটা হাই তুলে, বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে সে ঝিমুতে বসল উঠানে। বাচ্চাটার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

কুকুরছানার নরম নরম রোঁয়াগুলো হাতের উপর নেপটে যাচ্ছে মনচনিয়ার। রেশমের মত। বেশ আরাম লাগে। ওর মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে আরাম নিতে গেলে কি রকম যেন গা সির সির করে। অথচ সে সিরসিরিনিটুকু খারাপ লাগে না। আঙুলের ডগায় একটা কোমল দেহের উত্তাপ একটু আনমনা করে দেয় মনচনিয়াকে।

......গেলে গেলে তো রোজ ফেলেই দিতে হয় দুধ। একটা টিনের কৌটার ঢাকনিতে দুধ গেলে বার করে সে বাচ্চাটার সম্মুখে রাখে। চুক চুক করে খাচ্ছে বাচ্চাটা। শব্দটা শুনতে ভারী মিষ্টি। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মনচনিয়া সেদিকে।

উঠানে কারিয়ার কান খাড়া হয়ে উঠেছে। তার ঔদাসীন্য কেটেছে। ছুটে এল বারান্দায়, ঢাকনিটার কাছে। "তুই আবার এলি কেন? পালা! যা বলছি।"

ঘ্যা-অ্যা-অ্যা করে একটা শব্দ বার করল কারিয়া গলা দিয়ে।

"এ কি তোর খাওয়ার জিনিস নাকি! রাগ দেখালেই অমনি হল! এতটুকু বাচ্চার সঙ্গে রেষারেষি! লজ্জা করে না। যা পালা!"

ঘ-র্-র্-র্-র্।

অর্থাৎ এ ব্যবস্থা কারিয়ার অপছন্দ; কিন্তু হুকুম না মেনে উপায় কি……

বাড়ির কাজকর্ম সেরে মনচনিয়া ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বার হল উঠান থেকে। চিরকালের অভ্যাস মত কারিয়াও আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"তুই আবার উঠলি কেন? তুই থাক! আজ আর তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না! আবার কথা শোনে না! যা! যা বলছি বাড়ির মধ্যে!"

দরজার ঝাঁপ বাইরে থেকে বন্ধ করে মনচনিয়া যখন চলে গেল, কারিয়া তখন ঘেউ ঘেউ করে ডেকে পাড়া মাথায় করছে।

যার জন্য তার বাড়ির বাইরে যেতে কুণ্ঠা—ঠিক কি তাই হল! হাসির খোরাক পেলে ছেলেপিলেদের সত্যিই মায়া দয়া থাকে না; আজও মনচনিয়াকে আসতে দেখে তাদের মার্বেল খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।—আজ 'মুটকী-তরকারিউলিটা' একা কেন রে? শুঁটকী কুকুরটা নেই কেন রে?…আজ তারা ছড়া কেটে তার চলনভঙ্গীর নকল করে নাচেনি। শুধু নিজেদের মধ্যে পুতনা রাক্ষসীর কথা তুলে হাসাহাসি করেছে। মনচনিয়ার স্বকর্ণে শোনা। চোখ কান বুঁজে কোনরকমে সে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। তারপর যে বাড়িতে তরকারি বেচতে যায়, সে বাড়ির মেয়েরা দিনকয়েক আগেকার অঘটনটার সারা বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে।… পুলিশে যা ভাবেনি এরা হয়ত তাই ভেবে নিয়েছে! কে জানে! নইলে কোন মা কি এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে যার কপাল এমনভাবে পুড়েছে তাকে?…স্বামী তাকে এখন দু' তিনদিন বাড়ি বাড়ি শাকসবজি বেচতে যেতে বারণ করেছিল। বলেছিল, বাজারে গিয়ে বসতে তরকারি নিয়ে। ঠিকই বলেছিল। তখন বুঝতে পারেনি পরসাদীর কথা। ভেবেছিল বাড়ি বাড়ি ঘুরতে পরিশ্রম বেশী বলেই বুঝি সে ওকথা বলেছে।…

মনচনিয়া এর পর আর কোন গেরস্ত-বাড়িতে না গিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল বাজারে।

বাড়ি ফিরল স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে। ঝাঁপ খোলবার শব্দ পেয়ে কিন্তু কারিয়া লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল না। কোন সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপার কি? আলো জ্বালা হলে দেখা গেল যে, উঠানে কারিয়া শুয়ে রয়েছে কাত হয়ে পা ছড়িয়ে, আর কুকুরছানাটা তার শুকনো বুক প্রাণপণে চাটছে। মাঝে মাঝে চুঁ মেরে মেরে এ বোঁটা ছেড়ে ও বোঁটা ধরছে। মনচনিয়া কাছে গিয়ে বাচ্চাটাকে হাতে করে তুলে ধরায় কারিয়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।··· অনেকক্ষণ আগলেছি এটাকে তোমাদের কথামত, এখন তোমাদের জিনিস তোমরা বুঝে নাও। এক কাতে শুয়ে শুয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে গা হাত পা।···কারিয়া মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল বাড়ির বাইরে।

"এটার একটা নাম রাখতে হয় এখন থেকে। আমি তো ভেবেছি এটার নাম রাখব বাচ্চা।"

"হ্যাঁ বাচ্চা নামটা বেশ হবে।"

"বাচ্চা! ওরে বাচ্চা! আবার তাকান হচ্ছে পুটপুট করে। আঙুল চাটিসনি বলছি! বোকা কোথাকার! ওটা কি খাওয়ার জিনিস! খিদে পেয়েছে বুঝি? তা তো পাবেই। কমক্ষণ সময় তো না। দুধের বাচ্চাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। আয়।"

"কুঁই কুঁই করে যে শব্দটা করছে, ওটা হচ্ছে খিদে পাবার সময়ের ডাক, কুকুর-ছানাদের।"

পরসাদী খুশী হয়েছে স্ত্রীর ভাব দেখে।

"শুধু খিদে পাবার সময়ের কেন হবে; আরও কত সময় ওরা অমন করে ডাকে।"

মনচনিয়ার মুখে হাসি। ওই হাসিটুকু না থাকলে শেষের কথাটার

পরিবর্তনটা ? তার ভারী ইচ্ছা করে স্বামীকে ডেকে দেখায় ; কিন্তু পারে না সঙ্কোচে।

পরসাদীরও জিনিসটা নজরে পড়েছে ; কিন্তু একথা কি মনচনিয়ার কাছে তোলা যায় ?···

সে রাত্রিতে কতবার যে মনচনিয়ার ঘুম ভেঙ্গেছে তার ঠিক নেই। সারারাত কারিয়া ডেকেছে শিয়ালের গন্ধ পেয়ে।

ভোরে উঠে কারিয়া আর বাচ্চাটাকে উঠনে দেখতে পাওয়া গেল না। যাবে কোথায় ! 'সাতপুতিয়া' সীমের মাচাটার নীচে সিন্দুকের মত একটা কাঠের ঘর আছে। এক সময়ে মনচনিয়া হাঁস পুষেছিল : তাদের থাকবার জন্য এইটা তৈরী করিয়েছিল। দেখা গেল সেই হাঁসের ঘরে কারিয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরটার চারিদিক বন্ধ ; শুধু একদিকে হাঁস ঢুকবার একটা ছোট দরজা মতন আছে। এত ছোট যে কারিয়াকেও তার মধ্যে দিয়ে কষ্ট করে ঢুকতে হবে।

মাথা নীচু করে দেখতে গেল মনচনিয়া। ভিতরে অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় না।

ঘ-র্-র্-র-র্।···এখানে আবার কিসের দরকার ?

"আ মরণ ! চুপ কর বলছি কারিয়া !"

মনচনিয়া মাচা থেকে সীম পাড়ছে। খুট্ খাট্ করে শব্দ হচ্ছে, আর ডেকে ডেকে উঠছে কারিয়া। পরসাদী জিজ্ঞাসা করে—"ওটা অত ডাকে কেন ?"

"অপছন্দ।"

"সাতপুতিয়া সীমের মাচাটা ওর এলাকায় পড়েছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ, এই আর কি।"

"নতুন ছেলে পেয়েছে।"

"সাত জন্মের ছেলে !"

এ সম্বন্ধে স্বামীকে আর বেশী কথার সুযোগ না দেবার জন্য, মনচনিয়া কলসী নিয়ে চলে গেল সরকারী ইঁদারাতলায় !

পরসাদীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একটা অস্বস্তিকর জায়গায় এসে পৌঁছেছিল দুজনের কথা, নিজেদের অজানতে।

আজ তাদের যেতে হবে হরদা-হাটে তরকারি কিনতে। একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে; তাই পরসাদী উনুন ধরাতে বসল। পাটকাঠি ভাঙবার শব্দ শুনে কারিয়া ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে।

"বাবা রে বাবা! কুটোটি ভাঙবার জো নেই!"

সত্যিই তাই। কাক মাচায় বসলে কারিয়া ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠছে; পরসাদী উঠনে চলাফেরা করলে ডেকে উঠছে; বাড়ির চালে চিল বসতে দেখলে ডাকছে; দরজার বাইরে বিড়াল দেখলে ডাকছে। ...সবাই শত্রু; সকলের কাছ থেকে বিপদ আসতে পারে; চোখে চোখে রাখ; আগলে থাক; বিপদের গন্ধ নাকে এলেই ডেকে ভয় দেখাও; চোক কান নাক সব খুলে রাখ চব্বিশ ঘণ্টা, কাউকে বিশ্বাস নেই; শত্রু আক্রমণ করবার আগেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়; সময় দিলেই আর পারবে না তার সঙ্গে।...

নালীর মুখে একটা বেজি দেখতে পেয়ে হাঁসের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কারিয়া। উনুনের পাশ থেকে বেশ ভাল করে দেখল কুকুরটাকে পরসাদী।...চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে কারিয়ার নূতন বাচ্চা হবার সব লক্ষণ তার দেহে আর হাবভাবে সুস্পষ্ট। কুকুরছানাটাও তার পিছনে পিছনে হাঁস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেজিটা ভয়ে পালিয়েছে। তবু কারিয়ার হাঁক-ডাক, লাফ-ঝাঁপ থামে না।.. ভারে ঝুলে পড়া বুক প্রায় মাটিতে এসে ঠেকেছে। চলন্ত অবস্থাতেও কুকুরছানাটা কারিয়ার বুক চাটা ছাড়েনি।...কিন্তু ওকি?...ঠিকই তো তাই!...কোন ভুল নেই!...এ কি করে সম্ভব হল!...ওরা দুটোতে আবার ঢুকে গেল হাঁসের-ঘরে।...অবাক হয়ে গেল পরসাদী। জন্তুজানোয়ারদের যে এরকম হতে পারে, সেকথা তার জানা ছিল না। মনচনিয়া কি দেখেছে? মনচনিয়াকে খবরটা দেবে নাকি? পরসাদীর তো ইচ্ছা হচ্ছে, পাড়ার লোকদের

ডেকে এনে তামাসাটা দেখায়; কিন্তু সে উপায় যে নাই। তার মুখ যে বন্ধ!...

হরদা-হাটে যাবার পথে মনচনিয়া কথা তুলেছিল কুকুর দুটোর সম্বন্ধে। খেতে ডাকলেও আজ কারিয়া হাঁস-ঘর থেকে বার হয়নি; না খেল নিজে, না খেতে দিল বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটার জন্যই ভাবনা বেশী!....

"আরে, না খেয়ে কি কেউ থাকতে পারে।" বলি বলি করেও এর চেয়ে পরিষ্কার করে কথাটা বলতে পারল না পরসাদী মনচনিয়াকে। কিন্তু মনচনিয়া বোঝে তবে তো! বুঝল কই!...

বাড়ি ফিরতে বিকাল হয়ে গেল। অতটুকু বাচ্চাটা সারাদিন না খেয়ে রয়েছে, এ এক দারুণ অস্বস্তি মনচনিয়ার। টিনের কৌটোর ঢাকনিটা নিয়ে সে গেল হাঁস-ঘরের দিকে।

"বাচ্চা! বাচ্চা! আ-তু-উ-উ আয়! কুর্-কুর্-কুর্-কুর্-কুর্-কুর্!"

পরসাদী ঘরের ভিতর থেকে বলে—"ও আর এসেছে!"

সত্যিই বাচ্চাটা এল না।

ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে মুখ বার করে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে কারিয়া। দাঁত বার করে যেন কামড়াতে আসছে।

"তুই ডেকে মরছিস কেন! চুপ কর!"

হাত বাড়াতেই ক্ষেপে বেরিয়ে এল কারিয়া। চেনা কারিয়া নয়; এ একেবারে অন্য মূর্তি। ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝবার আগেই, শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। আঁচড়ে, কামড়ে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায় মনচনিয়াকে। মনচনিয়া ছিটকে গিয়ে পড়েছে লাউগাছটার উপর। পরনের কাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে গিয়েছে; হাতের একটা জায়গা থেকে রক্তের ধারা বইছে; পরসাদী এসেছে হৈ হৈ করে লাঠি নিয়ে; কিন্তু মনচনিয়ার এসব দিকে খেয়াল নাই। হাঁস-ঘরের ঘুলঘুলির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় পর্যন্ত সে কারিয়ার বুকের দিক থেকে নজর ফেরায়নি।...দুধ এসেছে কারিয়ার

বুকে !···ওই গরম, ভিজে, থলথলে মাংসপিণ্ডের ভার তার হাতের উপর পড়েছিল যখন কুকুরটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।···হ্যাঁ ভিজে ! সত্যিই ভিজে ! দুধ গড়াচ্ছিল কারিয়ার বুক থেকে !···এখনও দুধ লেগে রয়েছে হাতের সেই জায়গাটাতে।

তার নিজের অভিশাপের বোঝা জগদ্দল পাথরের চেয়েও ভারী হয়ে উঠেছে।